সেবা হরর

নেকড়ের ডাক

অনীশ দাস অপু



হুমায়ূন আহমেদ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার 'ছায়াসঙ্গী', 'কুটু মিয়া' এবং টিভি সিরিজ 'অদেখা ভূবন' আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আর আমার এ বইয়ের গল্পগুলোর ভয়াল আবহ আপনাকে দারুণভাবে চমকে দেবে [অবশ্য আপনি যদি-সময় করে বইটি পড়েন তবেই]।

আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

নেকড়ের ডাক

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

খুদে ঘাতক

খুন হয়ে যাচ্ছে, এই ভয়টা যেদিন থেকে পেয়ে বসল ওকে, সাহস করে কথাটা কাউকে বলতে পারেনি। আশঙ্কাটা একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল, গত কয়েকমাস ধরে, ধীরে ধীরে প্রবল হচ্ছিল সন্দেহ, ছোট্ট কয়েকটা ঘটনা সেটাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। গভীর এবং তীব্র এক স্রোতের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে সে এই মুহূর্তে, নিচের দিকে প্রচণ্ড জোরে কে যেন টানছে ওকে, কালো এবং বিশাল এক গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে। অষ্টশুঁড়, টেনিস বল সাইজের ড্যাবডেবে চোখওয়ালা বিকট চেহারার কি ওটা? গোল গোল, চাকা চাকা দাগ শুঁড়গুলোর, এক সঙ্গে প্রসারিত হলো সবক'টা; একটা ঝিলিক দেখল সে শুধু, পরক্ষণে টের পেল হিলহিলে শুঁড়গুলো তাকে বেঁধে ফেলেছে ঠাণ্ডা, কঠিন নিষ্পেষণে। মুখ হাঁ হয়ে গেল তার, চিৎকার করতে যাচ্ছে গলা ফাটিয়ে···

ঘরটাকে তার মনে হলো বিশাল এক সমুদ্র, ভেসে আছে সে। কিন্তু চারপাশে ওরা কারা? সাদা মুখোশ পরা, হাতে ধারাল যন্ত্রপাতি, কথা বলছে নিচু স্বরে। কে আমি, ভাবার চেষ্টা করল সে; কি নাম আমার?

শায়লা হক। বিদ্যুৎচমকের মত নিজের নামটা মনে পড়ল তার। মাহবুবুল হকের স্ত্রী। কিন্তু তারপরও অস্বস্তি বোধটা দূর হলো না। নিজেকে ভীষণ একা এবং অসহায় মনে হচ্ছে মুখোশধারী লোকগুলোর মাঝে। প্রচণ্ড ব্যথা তার শরীরে, বমি উগরে আসতে চাইছে, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে মৃত্যুভয়।

আমি ওঁদের চোখের সামনে খুন হয়ে যাচ্ছি, ভাবল শায়লা। ডাক্তার কিংবা নার্সরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছেন না আমার শরীরে কি ভয়ঙ্কর একটা জিনিস ঘাপটি মেরে আছে। জানে না মাহবুবও। শুধু আমি জানি। আর জানে ওই খুনেটা—খুদে গুপ্তঘাতক।

মারা যাচ্ছি আমি। কিন্তু কাউকে কথাটা বলতে পারছি না। আমার সন্দেহের কথা শুনলে ওঁরা হাসবেন, বিদ্রূপ করে বলবেন প্রলাপ বকছি আমি। কিন্তু খুনেটাকে ওঁরা ঠিকই কোলে তুলে নেবেন, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবেন না আমার মৃত্যুর জন্যে ওটাই দায়ি। শুধু সবাই শোক প্রকাশ করবে আর আমার খুনীর জন্যে সবার দরদ উথলে পড়বে।

মাহবুব কোথায়? অবাক হলো শায়লা। নিশ্চয়ই ওয়েটিং রূমে। একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকছে আর ঘড়ির দিকে একঠায় তাকিয়ে অপেক্ষা করছে কখন শুনবে সংবাদটা। শায়লার শরীর হঠাৎ ঘেমে গোসল হয়ে গেল, প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল ও। এবার! আসছে ওটা! আমাকে খুন করতে আসছে!

চিৎকার শুরু করল সে। কিন্তু আমি মরব না! কিছুতেই মরব না!

বিশাল এক শূন্যতা গ্রাস করল শায়লাকে। খালি খালি লাগল পেট। ব্যথাটা হঠাৎই চলে গেছে। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগল নিজেকে। অন্ধকারের একটা পর্দা দ্রুত নেমে আসছে চোখের ওপর। হে খোদা, আঁধারের রাজ্যে হারিয়ে যেতে যেতে ভাবল শায়লা, শেষ পর্যন্ত ঘটেছে তাহলে ব্যাপারটা···

পায়ের শব্দ শুনতে পেল শায়লা। আস্তে আস্তে কে যেন হেঁটে আসছে।

দূরে, একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। ওকে এখন ডিস্টার্ব কোরো না।'

পরিচিত শেভিং লোশনের সুঘ্রাণ স্বর্গের শান্তি বইয়ে দিল শায়লার শরীরে। মাহবুব। ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর কণ্ঠটা ডা. মোখলেসুর রহমানের।

চোখ খুলল না শায়লা। নরম গলায় বলল, 'আমি জেগে আছি।' অবাক কাণ্ড। কথা বলছে সে। তার মানে মারা যায়নি!

'শায়লা!' অনুভব করল ওর হাতদুটো উষ্ণ আবেগে চেপে ধরেছে মাহবুব।

তুমি খুনেটার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ, মাহবুব, ভাবল শায়লা। আমি শুনতে পাচ্ছি তুমি ওটাকে দেখতে চাইছ, তাহলে আমার আর কিছুই বলার নেই। চোখ খুলল শায়লা। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাহবুব। দুর্বল হাতটা বাড়াল শায়লা, শুজনিটা সরাল একপাশে।

ঘাতক তাকাল মাহবুবের দিকে। তার ছোট্ট মুখটা লাল, কালো গভীর চোখ জোড়া শান্ত। ঝিকমিক করছে।

'ইস্‌সিরে!' হেসে উঠল মাহবুব। 'কি সুন্দর আমার সোনাটা!' চুমু খাওয়ার জন্য ঝুঁকল সে, আস্তিন ধরে টান দিলেন ডা. মোখলেসুর রহমান।

'না, না, এখন নয়, পরে,' বললেন তিনি। 'নবজাতক শিশুকে এভাবে চুমু খেতে নেই। তুমি আমার চেম্বারে এসো। কথা আছে।'

যাওয়ার আগে শায়লার হাতে চাপ দিল মাহবুব। কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'ধন্যবাদ, শায়লা। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ক্লিষ্ট হাসল শায়লা। কিছু বলল না।

ডাক্তারের রুমে ঢুকল মাহবুব। হাত ইশারায় ওকে বসতে বললেন মোখলেসুর রহমান। একটা সিগারেট ধরালেন। গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ চুপচাপ টানলেন ওটা। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। সোজা তাকালেন মাহবুবের চোখে।

'বাচ্চাটাকে তোমার স্ত্রী মেনে নিতে পারছে না, মাহবুব।'

'কি!'

'ওর জন্য খুব কঠিন সময় গেছে। তোমাকে তখন বলিনি তোমার টেনশন বাড়বে বলে। ডেলিভারী রুমে শায়লা হিস্টিরিয়া রোগীর মত চিৎকার করে অদ্ভুত সব কথা বলছিল—আমি ওগুলো রিপিট করতে চাইছি না। তবে বুঝতে পারছি বাচ্চাটাকে সে নিজের বলে ভাবতে পারছে না। তবে এর কারণটা আমি তোমাকে দু'একটা প্রশ্ন করে জানতে চাই।' সিগারেটে বড় একটা টান দিলেন ডাক্তার, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বাচ্চাটা কি "ওয়ান্টেড চাইল্ড" মাহবুব?'

'একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'জানাটা খুব জরুরী।'

'অবশ্যই সে ''ওয়ান্টেড চাইল্ড'', আমরা একসঙ্গে এ নিয়ে প্ল্যান করেছি। শায়লা তখন কত খুশি—।'

'হুম্‌ম্—সমস্যাটা তো হয়েছে ওখানেই। যদি বাচ্চাটা আনপ্ল্যানড হত তাহলে ব্যাপারটাকে সাধারণ একটা কেস বলে ধরে নিতাম। অপ্রত্যাশিত শিশুকে বেশিরভাগ মা-ই ঘৃণা করে। কিন্তু শায়লার ক্ষেত্রে এটা ঠিক মিলছে না।'

মোখলেসুর রহমান সিগারেটটা ঠোঁট থেকে আঙুলের ফাঁকে ধরলেন, অন্য হাত দিয়ে চোয়াল ঘষতে ঘষতে বললেন, 'তাহলে ব্যাপারটা অন্য কিছু হবে। হয়তো শৈশবের কোন ভীতিকর স্মৃতি ওর তখন মনে পড়েছে। কিংবা আর সব মায়ের মতই সন্তান জন্ম দেবার সময় মৃত্যুভয় ওকে কাবু করে ফেলেছিল। যদি এরকম কিছু হয় তাহলে দিন কয়েকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে, মাহবুব, একটা কথা—শায়লা যদি তোমাকে বাচ্চাটার ব্যাপারে কিছু বলে···মানে··· ইয়ে, সে চেয়েছিল বাচ্চাটা মৃত জন্ম নিক, তাহলে কিন্তু শক্‌ড্ হয়ো না। আশা করছি সব ঠিক থাকবে। আর যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে ওদেরকে নিয়ে এই ব্যাচেলর বুড়ো ডাক্তার চাচার চেম্বারে চলে এসো, কেমন? তোমাদেরকে এমনিতেও দেখতে পেলে খুবই খুশি হব।'

'ঠিক আছে, চাচা। শায়লা একটু সুস্থ হলেই সপরিবারে আপনার বাসায় আবার যাব।'

চমৎকার একটি দিন। মৃদু গুঞ্জন তুলে টয়োটা স্কারলেট ছুটে চলেছে লালমাটিয়ার দিকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মাহবুব। আহা, কি সুন্দর নীল আকাশটার রঙ! কাঁচ নামিয়ে দিল ও। রাস্তার পাশের একটা ফুলের দোকান থেকে রজনীগন্ধার সুবাস ঝাপটা মারল নাকে। প্রাণভরে গন্ধটা টানল মাহবুব। বেনসনের আনকোরা প্যাকেটটার সেলোফেন ছিঁড়ে একটা সিগারেট গুঁজল ঠোঁটে। টুকটাক কথা বলছে শায়লার সঙ্গে। শায়লা হালকাভাবে জবাব দিচ্ছে। বাচ্চাটা ওর কোলে। মাহবুব খেয়াল করল আলগোছে ধরে আছে সে ছোট্ট মানুষটাকে। মাতৃসুলভ কোন উষ্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে না শায়লার আচরণে। যেন কোলে শুয়ে আছে চীনে মাটির একটা পুতুল। ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করল মাহবুব।

'আচ্ছা!' শিস দিয়ে উঠল ও। 'খোকন সোনার কি নাম রাখব আমরা?'

শায়লা বাইরের সবুজ গাছগাছালি দেখতে দেখতে উদাসীন গলায় বলল, 'এখনও ঠিক করিনি। তবে একদম আলাদা কোন নাম রাখতে চাই আমি। এখনই এ নিয়ে গবেষণায় বসতে হবে না। আর দয়া করে বাচ্চার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ো না তো।' বলল বটে, কিন্তু এ যেন নিছক বলার জন্যই বলা।

শায়লার গা ছাড়া ভাব আহত করল মাহবুবকে। সিগারেটটা ফেলে দিল জানালা দিয়ে। 'দুঃখিত,' বলল ও।

বাচ্চাটা চুপচাপ শুয়ে আছে তার মায়ের কোলে। দ্রুত অপসৃয়মান গাছের ছায়ারা খেলা করছে তার মুখে। কালো চোখ দুটো খোলা। ছোট্ট, গোলাপী, রবারের মত মুখ হাঁ করে ভেজা শ্বাস ফেলছে।

শায়লা এক পলক তাকাল তার বাচ্চার দিকে। শিউরে উঠল।

'ঠাণ্ডা লাগছে?' জানতে চাইল মাহবুব।

'অল্প। কাঁচটা উঠিয়ে দাও, মাহবুব,' ঠাণ্ডা গলায় বলল শায়লা।

মাহবুব ধীরে জানালার কাঁচ ওঠাল।

দুপুর বেলা।

মাহবুব খোকন সোনাকে নার্সারী রুম থেকে নিয়ে এসেছে. উঁচু একটা চেয়ারের চারপাশে অনেকগুলো বালিশ রেখে তার মধ্যে শোয়াল ওকে।

শায়লা প্লেটে ভাত বাড়তে বাড়তে বলল, 'ওকে অত উঁচু চেয়ারে শুইয়ো না। পড়েটড়ে যাবে।'

'আরে না, পড়বে না। দেখো টুটুবাবু এখানেও দিব্যি আরামে ঘুমাবে।' হাসছে মাহবুব। খুব ভাল লাগছে ওর। 'দেখো দেখো, বাবু সোনার মুখ দিয়ে লালা পড়ে কেমন চিবুক ভিজিয়ে দিয়েছে!' তোয়ালে দিয়ে বাচ্চার মুখ মুছে দিল মাহবুব। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল এদিকে তাকিয়ে নেই শায়লা।

'বুঝলাম সন্তান জন্ম নেবার সময়টা খুব সুখকর কিছু নয়,' চেয়ারে বসতে বসতে বলল মাহবুব। 'কিন্তু সব মায়েরই তার বাচ্চার প্রতি কিছু না কিছু মায়া থাকে।'

ঝট করে মুখ তুলল শায়লা। 'ওভাবে বলছ কেন? ওর সামনে এসব কথা কক্ষনো বলবে না। পরে বোলো। যদি তোমার বলার এত ইচ্ছে থাকে।'

'কিসের পরে!' সংযম হারাল মাহবুব। 'ওর সামনে বললেই বা কি আর পেছনে বললেই বা কি?' হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল ও। ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেছে। শায়লার মানসিক অবস্থা এখন ভাল নয়। ওর সঙ্গে রাগারাগি করা চলবে না। ঢোক গিলল মাহবুব। নিচু গলায় বলল, 'দুঃখিত, শায়লা।'

কোন কথা বলল না শায়লা। প্রায় নিঃশব্দে শেষ হলো ওদের মধ্যাহ্ন ভোজন।

রাতে, ডিনারের পর, মাহবুব বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেল ওপরে। শায়লা ওকে কিছু বলেনি। কিন্তু ওর নীরব অভিব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিল কাজটা মাহবুবকেই করতে হবে।

নার্সারীতে খোকন সোনাকে রেখে নিচে নেমে এল মাহবুব। ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্র সঙ্গীত চাপিয়েছে শায়লা, সম্ভবত—শুনছে না। ওর চোখ বন্ধ, আড়ষ্ট ভাবে শুয়ে আছে বিছানায়। শব্দহীন পায়ে এগিয়ে এল মাহবুব। দাঁড়াল শায়লার পাশে। একটা হাত রাখল চূর্ণ কুন্তলে। চমকে চোখ মেলে চাইল শায়লা। স্বামীকে দেখে স্বস্তি ফুটে উঠল দু'চোখের তারায়। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, জড়িয়ে ধরল সে মাহবুবকে। মাহবুব টের পেল ওর আড়ষ্ট শরীর ধীরে ধীরে নমনীয় হয়ে যাচ্ছে, যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল কোন কারণে, এখন পরম আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে স্বামীর বুকে। মাহবুব ওর ঠোঁট খুঁজল। অনেকক্ষণ এক হয়ে থাকল দু'জোড়া অধর।

'তুমি, তুমি খুব ভাল, মাহবুব!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শায়লা। 'কত নিশ্চিন্তে তোমার ওপর ভরসা করতে পারি আমি! এত নির্ভরযোগ্য তুমি!'

হাসল মাহবুব। 'বাবা বলতেন—পুত্র, মনে রেখো, তোমার সংসারে তুমিই

একমাত্র অবলম্বন।'

কালো, উজ্জ্বল কেশরাজি ঘাড় থেকে সরাল শায়লা। 'তোমার বাবার যোগ্য পুত্রই হয়েছ বটে। তোমাকে পেয়ে এত সুখী আমি। জানো, প্রায়ই ভাবি এখনও যেন আমরা নবদম্পতিই রয়ে গেছি। আমাদের নিজেদের ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে হচ্ছে না, কারও দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না, আমাদের কোন সন্তান নেই।'

মাহবুবের হাত দুটো নিজের গালে ছোঁয়াল শায়লা। হঠাৎ অস্বাভাবিক সাদা হয়ে উঠেছে তার মুখ।

'ওহ, মাহবুব, একটা সময় ছিল যখন ছিলাম শুধু তুমি আর আমি। আমরা পরস্পরকে নিরাপত্তা দিতাম। আর এখন এই বাচ্চাটাকে আমাদের নিরাপত্তা দিতে হবে, কিন্তু বদলে তার কাছ থেকে কোন নিরাপত্তা পাব না। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ? হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আমি কত কিছু চিন্তা করেছি। দুনিয়াটা হচ্ছে একটা মন্দ জায়গা—'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আইন সকল মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করে। যখন আইন বলে কিছু থাকে না তখন ভালবাসা নিরাপত্তার সন্ধান দেয়। আমি তোমাকে আঘাত করছি, কিন্তু আমার ভালবাসা তোমাকে রক্ষা করছে। যদি ভালবাসা না থাকত তাহলে পৃথিবীর সব মানুষই অসহায় হয়ে পড়ত। আমি তোমাকে ভয় পাই না; কারণ আমি জানি তুমি আমার ওপর যত রাগ করো, বকা দাও, খারাপ ব্যবহার করো,সব কিছুর ওপর ছাপিয়ে ওঠে আমার প্রতি তোমার গভীর প্রেম, নিবিড় ভালবাসা। কিন্তু বাচ্চাটা? ও এত ছোট যে ভালবাসা কিংবা অন্য কোন কিছুই সে বুঝবে না যতক্ষণ না আমরা তাকে ব্যাপারটা বোঝাই। যেমন ধরো, ও কি এখন বুঝবে কোনটা ডান আর কোনটা বাম?'

'এখন বুঝবে না। তবে সময় হলে শিখে নেবে।'

'কিন্তু…।' কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল শায়লা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মাহবুবের বাহুবন্ধন থেকে।

'কিসের যেন শব্দ শুনলাম!'

মাহবুব চারদিকে চাইল। 'কই, আমি তো কিছু শুনিনি…।'

লাইব্রেরি ঘরের দরজার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে শায়লা। 'ওই ওখানে,' ফিসফিস করে বলল সে।

ঘর থেকে বেরুল মাহবুব, খুলল লাইব্রেরি ঘরের দরজা। আলো জ্বেলে এদিক ওদিক চাইল। কিছু চোখে পড়ল না। আলো নিভিয়ে আবার ফিরে এল শায়লার কাছে। 'নাহ্, কিচ্ছু নেই,' বলল ও। 'তুমি আসলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। নাও, এখন শুতে চলো দেখি।'

নিচতলার সব আলো নিভিয়ে ওরা উঠে এল ওপরে। সিঁড়ির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে শায়লা বলল, 'অনেক আজেবাজে কথা বলেছি, মাহবুব। কিছু মনে কোরো না। আসলেই আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই।'

শায়লার কাঁধে হাত রাখল মাহবুব। মৃদু চাপ দিল। কিছু মনে করেনি সে।

নার্সারী রূমের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল শায়লা, ইতস্তত করছে। তারপর হাত বাড়াল পেতলের নবের দিকে, দরজা খুলে পা রাখল ভেতরে। খুব সাবধানে এগিয়ে চলল বাচ্চার দোলনার দিকে। ঝুঁকল শায়লা, সঙ্গে সঙ্গে কাঠ হয়ে গেল শরীর। 'মাহবুব!' চিৎকার করল ও।

দৌড়ে দোলনার কাছে চলে এল মাহবুব।

বাচ্চাটার মুখ টকটকে লাল, সম্পূর্ণ ভেজা; ছোট্ট হাঁ-টা বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে; চোখদুটো যেন জ্বলছে রাগে। হাতজোড়া সে উঠিয়ে রেখেছে শূন্যে, যেন বাতাস খামচে ধরার চেষ্টা করছে।

'আহারে,' দরদ ঝরে পড়ল মাহবুবের গলায়, 'বাবু সোনাটা না জানি কতক্ষণ ধরে কেঁদেছে!'

'কেঁদেছে?' শায়লা দোলনার একটা পাশ আঁকড়ে ধরল ভারসাম্য রক্ষার জন্য। 'কই, কান্নার আওয়াজ তো শুনলাম না।'

'দরজা বন্ধ, শুনবে কি করে?'

'এ জন্যই বোধহয় ওর মুখ এত লাল আর এত জোরে শ্বাস টানছে?'

'অবশ্যই। আহারে, আমার সোনা রে! অন্ধকারে একা কেঁদে কেঁদে না জানি কত কষ্টই পেয়েছে। আজ রাতে ওকে আমাদের ঘরে নিয়ে যাই, কি বলো? এখানে একা থাকলে আবার যদি কাঁদে।'

'আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই ওকে নষ্ট করবে,' বলল শায়লা।

কোন কথা না বলে বাচ্চাটাকে দোলনা সহ নিজেদের শোবার ঘরে নিয়ে চলল মাহবুব। টের পেল শায়লার চোখ তাদেরকে অনুসরণ করছে।

নিঃশব্দে কাপড় ছাড়ল মাহবুব। বসল খাটের এক কোনায়। হঠাৎ কি মনে পড়তে হাতের তালুতে ঘুসি মারল ও।

'ধুত্তুরি! তোমাকে বলতে ভুলেই গেছি। আমাকে সামনের শুক্রবার হংকং যেতে হবে।'

'আবার হংকং কেন?'

'যাওয়ার কথা ছিল তো আরও দু'মাস আগে। তোমার কথা ভেবে যাওয়াটাকে পিছিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওদিকের অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে না গেলেই নয়।'

'কিন্তু তুমি গেলে যে আমি একদম একা হয়ে পড়ব।'

'তোমার জন্য নতুন কাজের একটা বুয়া ঠিক করেছে আউয়াল। মহিলা শুক্রবার আসবে। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া আমি তো মাত্র অল্প ক'টা দিন থাকব।'

'তবুও আমার ভয় করছে। কেন জানি না এত বড় বাড়িতে একা থাকার কথা ভাবলেই বুকটা গুড়গুড় করে ওঠে। আমি যদি তোমাকে সব কথা খুলে বলি তুমি নির্ঘাত আমাকে পাগল ঠাওরাবে। আমার মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাব।'

বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল মাহবুব। ঘরের বাতি নেভানো। অন্ধকারে বিছানার ধারে হেঁটে এল শায়লা, লেপটা তুলল, ঢুকল ভেতরে। ক্রিমের মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এল, রমণীর উষ্ণ শরীর উত্তেজিত করে তুলল মাহবুবকে। সে শায়লাকে জড়িয়ে ধরল। 'তুমি যদি আমাকে আরও কয়েকটা দিন পরে যেতে বলো তাহলে আমি—'

'না,' শরীর থেকে মাহবুবের হাতটাকে আস্তে সরাল শায়লা। 'তুমি যাও। আমি জানি ব্যাপারটা জরুরী। আমি আসলে তোমাকে যে কথাগুলো তখন বললাম সেগুলো সম্পর্কে এখন ভাবছি। আইন, ভালবাসা এবং নিরাপত্তা। আমার ভালবাসা তোমাকে নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু বাচ্চাটা—' শ্বাস টানল ও। 'তোমাকে সে কি নিরাপত্তা দেবে, মাহবুব?'

কি বলা যায় ভাবছিল মাহবুব। বলবে কিনা যে সে যতসব আজগুবি ব্যাপার নিয়ে অহেতুক চিন্তা করে মরছে? এমন সময় খুট্ করে বেড সুইচ টিপল শায়লা। সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হলো বেডরুম।

'দ্যাখো,' আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল শায়লা।

বাচ্চাটা শুয়ে আছে দোলনায়। কালো চকচকে চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

আবার বাতি নেভাল শায়লা। সরে এল মাহবুবের দিকে। থরথর করে কাঁপছে ওর শরীর।

'যাকে আমি জন্ম দিয়েছি তাকে এত ভয় পাব কেন,' শায়লার ফিসফিসে কণ্ঠ কর্কশ এবং দ্রুত হয়ে উঠল। 'কারণ ও আমাকে খুন করতে চেয়েছে। ও ওখানে শুয়ে আছে, আমাদের সব কথা শুনছে, সব বুঝতে পারছে। অপেক্ষা করছে কবে তুমি বাইরে যাবে আর সে আবার আমাকে খুন করার চেষ্টা চালাবে। খোদার কসম বলছি!' কান্নায় গলা বুজে এল শায়লার।

'প্লীজ!' ওকে থামাতে চেষ্টা করল মাহবুব। 'কেঁদো না, প্লীজ!'

অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল শায়লা অন্ধকারে। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে থাকল। আস্তে-আস্তে কাঁপুনিটা কমে গেল, নিঃশ্বাস হয়ে উঠল স্বাভাবিক এবং নিয়মিত। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

চোখ লেগে এল মাহবুবেরও।

ঘুমের গভীরতর স্তরে যেতে যেতে একটা শব্দ শুনল সে।

ছোট্ট, ভেজা, রবারের ঠোঁট থেকে চটচট শব্দ। ঘুমিয়ে পড়ল মাহবুব।

সকালবেলা ঝরঝরে মন নিয়ে ঘুম থেকে জাগল ওরা। শায়লা মধুর হাসল স্বামীর দিকে চেয়ে। হাতঘড়িটা দোলনার ওপর দোলাল মাহবুব, সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল কাঁচ। 'দেখো, বাবু, দেখো, কি চকমকে, কি সুন্দর! কি চকমকে, কি সুন্দর!' সুর করে বলছে সে।

আবারও হাসল শায়লা স্বামীর ছেলেমানুষী দেখে। মনে এখন ওর আর কোন শঙ্কা নেই। মাহবুব নিশ্চিন্তে তার ব্যবসার কাজে হংকং যেতে পারে। ভয় পাবে না শায়লা। বাবুর যত্ন ঠিকই নিতে পারবে সে।

শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ বিমানের ডিসি-১০-এ উড়াল দিল মাহবুব। নীল আকাশ, পেঁজা তুলো মেঘ আর সূর্যের ঝকঝকে সোনালি রশ্মি ছুঁয়ে গেল ওকে। ফ্রেশ মুড নিয়ে হংকং-এর এয়ারপোর্টে পা রাখল ও। শেরাটন হোটেলে আগেই রুম বুক করা ছিল। ওখানে উঠে প্রথমেই লং ডিসট্যান্স কলে শায়লাকে ফোন করে জানাল, সে ঠিকঠাক মত পৌঁচেছে। তারপর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাহবুব। ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা ওর। পরবর্তী ছ'টা দিন ঝড় বয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে একটা বিজনেস ডিল করতে গিয়ে। এর মধ্যে একদিন ঢাকায় ফোন করল ও। কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া পেল না। ফোন ডেড। তবে চিন্তিত হলো না মাহবুব। মাঝে মাঝে এভাবে ফোন ডেড হয়ে পড়ে ওদের বাসায়। কাছের এক্সচেঞ্জে কমপ্লেন জানালে আবার ঠিক হয়ে যায়। এবারও ওরকম কিছু একটা হয়েছে ভেবে ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবল না সে। কাজের মধ্যে এত বুঁদ হয়ে গেল যে বাড়ির কথা প্রায় মনেই পড়ল না। সপ্তম দিনে ব্যাংকোয়েট হলে একটা কনফারেন্স সেরে রুমে ফিরেছে মাহবুব, জামা কাপড় ছাড়ছে বিশ্রাম নেয়ার জন্য, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন। অপারেটর জানাল ঢাকা থেকে ট্রাঙ্ককল। খুশি হয়ে উঠল মাহবুব। নিশ্চয় শায়লা। যাক, তাহলে এবার ওদের বাসার ফোনটা তাড়াতাড়িই ঠিক হয়েছে।

'শায়লা?' আগ্রহ ভরে ডাকল মাহবুব।

'না, মাহবুব। ডা. মোখলেসুর রহমান বলছি।'

'ডাক্তার চাচা!'

'একটা খবর দেব। কিন্তু ভেঙে পড়া চলবে না। শোনো, শায়লা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার ক্লিনিকে আছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো। ওর নিউমোনিয়া হয়েছে, ভেব না, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব শায়লার জন্যে করব আমি। তবে ওর পাশে এখন তোমাকে খুব দরকার।'

হাত থেকে ফোন খসে পড়ল মাহবুবের। কোনমতে উঠে দাঁড়াল, পায়ের তলাটা ফাঁকা ঠেকল। মনে হলো অসীম এক ঘূর্ণির মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে ও। ঘরটা অস্পষ্ট হয়ে উঠল, দুলছে।

'শায়লা,' আর্তনাদ করে উঠল মাহবুব। অন্ধের মত এগোল সে দরজার দিকে।

'তোমার স্ত্রী মা হিসেবে খুব চমৎকার, মাহবুব। নিজের কথা সে একটুও ভাবেনি। বাচ্চাটার জন্যে চিন্তায় চিন্তায়...'

ডা. মোখলেসুর রহমানের একটা কথাও শুনছে না মাহবুব। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শায়লার পাণ্ডুর মুখের দিকে। শায়লার মুখের পেশী বার কয়েক কাঁপল, চোখ মেলে চাইল ও। অস্ফুট একটা হাসি ফুটল ঠোঁটে, তারপর কথা বলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে কথা বলছে শায়লা। মা হিসেবে বাচ্চার প্রতি একজন তরুণীর কি দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাই বর্ণনা দিচ্ছে সে। ধীরে ধীরে গলা চড়ল ওর, ভয় ফুটল কণ্ঠে, তীব্র বিতৃষ্ণা বিষোদগার হলো। ডাক্তারের মুখাবয়বে কোন পরিবর্তন হলো না, কিন্তু মাহবুব বারবার কেঁপে উঠল। থামাতে চাইল ও শায়লাকে, কিন্তু পারল

না।

'বাচ্চাটা ঘুমাতে চাইত না। আমি ভেবেছিলাম ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও দোলনায় শুয়ে থাকত আর শুধু চেয়ে থাকত। আর গভীর রাতে উঠে কাঁদতে শুরু করত। প্রচণ্ড জোরে কাঁদত ও, সারারাত। একের পর এক রাত। কত চেষ্টা করেছি থামাতে। পারিনি। আর আমিও ওর কান্নার চোটে একটা রাতও ঘুমাইনি।'

মাথা নাড়লেন ডা. মোখলেসুর রহমান। 'ক্লান্তির চরমে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু এখন ও দ্রুত আরোগ্যের পথে। কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে আশা করি।'

অসুস্থ বোধ করছে মাহবুব। 'বাচ্চা? আমার বাচ্চাটার কি অবস্থা?'

'ও ঠিকই আছে।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার চাচা। আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব...'

'ওকে, ওকে সান। এমনিতেই খাটো মানুষ আমি। কৃতজ্ঞ করে আরও খাটো কোরো না। বরং ধন্যবাদ প্রাপ্য তোমাদের ওই কাজের বুয়া জামালের মা না কি যেন নাম, তার। শায়লা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বাথরুমে। এমনিতেই ক্লান্ত শরীর, তারপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ভাগ্যিস নিউমোনিয়াটা ওকে খুব বেশি কাবু করার আগেই আমি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তোমাদের ওই কাজের বুয়াটা যদি বাথরুমের দরজা ভেঙে শায়লাকে বের করতে আরও ঘণ্টাখানেক দেরি করত তাহলে ওকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে উঠত। এনি ওয়ে, শায়লাকে তুমি শিগ্গিরই বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে। কাজেই চিন্তার কিছু নেই।'

ডাক্তার দরজাটা ভেজিয়ে চলে গেলেন। শায়লা দুর্বল গলায় ডাকল, 'মাহবুব!'

ঘুরল মাহবুব। জড়িয়ে ধরল শায়লাকে। শায়লা ওর হাত দুটো শক্ত করে ধরে থাকল। ভীত গলায় বলতে শুরু করল, 'আমি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলাম। তোমাকে বুঝতে দেইনি যে হাসপাতাল থেকে ফেরার পরেও আমি শরীরে পুরো শক্তি ফিরে পাইনি। কিন্তু বাচ্চাটা আমার দুর্বলতা টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই প্রতি রাতে ওটা কাঁদত। কিন্তু যখন কাঁদত না তখন অস্বাভাবিক রকম নীরব থাকত। আমি রাতে ঘরের বাতি জ্বালাতে সাহস পেতাম না। জানতাম আলো জ্বাললেই দেখব ও আমার দিকে একঠায় তাকিয়ে আছে।'

মাহবুব জড়িয়ে ধরে আছে শায়লাকে। শায়লার প্রতিটি কথা ও উপলব্ধি করতে পারছে অন্তরে অন্তরে। বাচ্চাটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও, টের পাচ্ছে ওর উপস্থিতি। এই বাচ্চা প্রতিদিন গভীর রাতে ঘুম থেকে জাগে যখন আর সবার বাচ্চারা স্বাভাবিক ভাবে ঘুমায়। এই বাচ্চা জেগে থাকে, যখন কাঁদে না তখন চিন্তা করে। আর তার দোলনা থেকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে। এসব কি হচ্ছে? নিজেকে ভর্ৎসনা করল মাহবুব। এত চমৎকার তুলতুলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসব কি ভাবছে সে। শায়লার দিকে মনোযোগ দিল সে।

শায়লা বলে চলেছে, 'আমি বাচ্চাটাকে খুন করতে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তাই। তুমি যেদিন হংকং গেলে তার পরদিনই আমি ওর ঘরে ঢুকে ঘাড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু হাত ঢুকিয়েই থাকলাম। অনেকক্ষণ নড়তেই পারলাম না। ভীষণ ভয় লাগছিল আমার। তারপর বিছানার চাদর দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে, উল্টো

অবস্থায় রেখে দৌড়ে পালালাম ঘর থেকে।'

মাহবুব ওকে থামাতে চাইল।

'না, আমাকে আগে শেষ করতে দাও।' দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ফেঁসফেঁসে গলায় বলল শায়লা। 'ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলাম ঠিক কাজটাই করেছি আমি। বাচ্চারা দোলনায় কাপড় পেঁচিয়ে এভাবে শ্বাসরোধ হয়ে কতই তো মারা যায়। কেউ জানবেই না যে আমিই কাজটা করেছি। কিন্তু ওকে মৃত অবস্থায় দেখব বলে যেই ঘরে ঢুকেছি···মাহবুব, বিশ্বাস করো, দেখি কি ও মরেনি! হ্যাঁ, মরেনি। বেঁচে আছে। তোষকে পিঠ দিয়ে হাসছে আর বড় বড় শ্বাস ফেলছে। তারপর ওকে আর আমার ধরার সাহসই হলো না। আমি সেই যে ও ঘর থেকে চলে এলাম আর সেদিকে গেলাম না। আমি ওকে খাওয়াতেও যাইনি কিংবা একবার দেখতেও যাইনি। হয়তো বুয়া ওকে খাইয়েছে। ঠিক জানি না আমি, শুধু এটুকু জানি সারারাত সে চিৎকার করে কেঁদে আমাকে জাগিয়ে রাখত। আর মনে হত সমস্ত বাড়িতে ওটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় আমি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়লাম।' হাঁফিয়ে উঠেছে শায়লা। দম নিতে একটু থামল। তারপর আবার শুরু করল, 'বাচ্চাটা ওখানে সারাদিন শুয়ে থাকে আর খালি আমাকে খুন করার পরিকল্পনা আঁটে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কারণ ও বুঝতে পেরেছে ওর সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। ওর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই; আমাদের মধ্যে কোন নিরাপত্তার বন্ধন নেই; কোনদিন হবেও না।'

দীর্ঘক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ল শায়লা। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাহবুব অনেকক্ষণ বসে থাকল ওর শিয়রে, নড়তে ভুলে গেছে যেন। ওর রক্ত জমাট বেঁধে গেছে শরীরে। কোথাও একটা নার্ভও কাজ করছে না।

দিন তিনেক পর শায়লাকে বাড়ি নিয়ে এল মাহবুব। সিদ্ধান্ত নিল পুরো ব্যাপারটা সে জানাবে ডাক্তার চাচাকে। মোখলেসুর রহমান অখণ্ড মনোযোগে মাহবুবের সব কথা শুনলেন।

তারপর বললেন, 'দেখো, মাহবুব, তুমি ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করো। কখনও কখনও মায়েরা তাদের সন্তানদের ঘৃণা করেন, এটা এক ধরনের দ্বৈতসত্তা। ভালবাসার মধ্যেই ঘৃণা, প্রেমিক প্রেমিকারা হরহামেশা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করছে। কয়েকদিন মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। বাচ্চারাও তাদের মায়েদের ঘৃণা করে···।'

বাধা দিল মাহবুব, 'আমার মাকে আমি কখনও ঘৃণা করিনি।'

'করেছ। কিন্তু স্বীকার করবে না। এটাই স্বাভাবিক। মানুষ তার প্রিয়জনদের ঘৃণা করার কথা কখনও স্বীকার করতে চায় না।'

'কিন্তু শায়লা তার বাচ্চাকে ঘৃণা করার কথা স্পষ্ট করে বলছে!'

'বরং বলো সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। ঘৃণা এবং ভালবাসার যে স্বাভাবিক দ্বৈতসত্তা রয়েছে, সে ওটা থেকে একটু এগিয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক ডেলিভারীর মাধ্যমে ওর বাচ্চার জন্ম। নরক যন্ত্রণা সহ্য করেছে সে সন্তান জন্ম দেয়ার সময়। এই প্রায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং নিউমোনিয়ার জন্যে শায়লা বাচ্চাটাকেই একমাত্র

দায়ী মনে করছে। নিজের সমস্যা সে নিজেই সৃষ্টি করছে, কিন্তু দায়ভারটা তুলে দিচ্ছে হাতের কাছে যাকে সবচেয়ে সহজ টার্গেট হিসেবে পাচ্ছে, তার ওপর। আমরা সবাই এটা করি। চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেলে দোষ দেই ফার্নিচারটার। অথচ নিজেরা যে সাবধান নই সেদিকে খেয়াল রাখি না। ব্যবসায় ফেল করলে অভিসম্পাত করি খোদা, আবহাওয়া কিংবা আমাদের ভাগ্যকে। তোমাকে নতুন করে কিছু বলার নেই। আগেও যা বলেছি আজও তাই বলছি। লাভ হার। ওকে আরও বেশি বেশি ভালবাস। পৃথিবীর সেরা ওষুধ হলো ভালবাসা। ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে ওর প্রতি তোমার স্নেহটাকে ফুটিয়ে তোলো, ওর মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তোলো। ওকে বোঝাও বাচ্চারা কত নিষ্পাপ আর মোটেও অনিষ্টকারী নয়। বাচ্চাটার মূল্য কারও চেয়ে কম নয় এই অনুভূতি ওর মধ্যে জাগিয়ে তোলো। দেখবে কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেছে। মৃত্যুভয় ভুলে যাবে শায়লা, ভালবাসতে শুরু করবে তার বাচ্চাকে। যদি আগামী মাসের মধ্যেও ওর কোন পরিবর্তন না দেখো, তাহলে আমাকে জানিও। ওকে কোন ভাল সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাব। এখন তুমি যেতে পারো। তবে দয়া করে চেহারা থেকে অসহায় ভাবটা মুছে ফেলো।'

শীত ফুরিয়ে বসন্ত এল। বসন্তকে বিদায় জানাল গ্রীষ্ম। মাহবুবদের লালমাটিয়ার বাড়িতে সব কিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। মাহবুব তার কাজে ব্যস্ত থাকছে ঠিকই, তবে বেশির ভাগ সময় সে ব্যয় করছে স্ত্রীর জন্যে। শায়লা এখন অনেকটাই সুস্থ। বিকেলে দু'জনে মিলে হাঁটতে যাচ্ছে ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে, কখনও সামনের লনে ব্যাডমিন্টনের নেট ঝুলিয়ে পয়েন্ট গুণে খেলছে, মাহবুবকে হারাতে পারলে হাততালি দিয়ে উঠছে বাচ্চাদের মত। আস্তে আস্তে শক্তি ফিরে পাচ্ছে শায়লা। মনে হচ্ছে ভয়টার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে ও।

তারপর একদিন রাতে প্রবল কাল বৈশাখী ঝড় হলো ঢাকা শহরে। আকাশের বুক চিরে সাপের জিভের মত ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল কাছে কোথাও, হাওয়ার ক্রুদ্ধ গর্জন যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগল বাড়িটাকে। সেই সঙ্গে কেঁপে উঠল শায়লা। ঘুম ভেঙে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে, ওকেও ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য করল। শায়লাকে আদর করতে করতে মাহবুব জানতে চাইল, কি হয়েছে।

ভয়ার্ত গলায় শায়লা বলল, 'কে যেন আমাদের ঘরে ঢুকেছে। লক্ষ করছে আমাদেরকে।'

আলো জ্বালাল মাহবুব। 'আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ,' সস্নেহে বলল সে। 'এতদিন তো ভালই ছিলে। আবার কি হলো?' আলো নেভাল সে।

অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শায়লা। তারপর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। ওকে বুকে চেপে ধরে থাকল মাহবুব, ভাবল তার এই মিষ্টি বউটা কি সামান্য কারণেই না ভয় পায়।

হঠাৎ ঘুম চটে যাওয়ায় আর ঘুম আসছিল না মাহবুবের। অনেকক্ষণ আগড়ুম বাগড়ুম ভাবল সে। শব্দটা হঠাৎ কানে এল। খুলে যাচ্ছে বেডরুমের দরজা।

ইঞ্চিকয়েক খুলে গেল পাল্লা দুটো।

কেউ নেই ওখানে। বাতাস থেমেছে বহুক্ষণ।

চুপচাপ শুয়ে থাকল মাহবুব। মনে হলো এক ঘন্টারও বেশি সময় সে অন্ধকারে শুয়ে আছে।

তারপর, অকস্মাৎ গোঙানির মত কান্নার আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। কাঁদছে বাচ্চাটা।

গোঙানির শব্দটা অন্ধকারের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে এল, ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, যেন প্রতিধ্বনি তুলল দেয়ালে। এই সময় আবার শুরু হলো ঝড়।

মাহবুব খুব আস্তে আস্তে একশো পর্যন্ত গুণল। থামছে না বাচ্চা, একভাবে কেঁদেই চলেছে।

সাবধানে শায়লার বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল মাহবুব, নামল বিছানা থেকে। স্যান্ডেলে পা গলিয়ে এগোল দরজার দিকে।

ও এখন নিচে, রান্নাঘরে যাবে, ঠিক করল মাহবুব। খানিকটা দুধ গরম করে চলে আসবে ওপরে, তারপর…।

মিশমিশে অন্ধকারটা যেন মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সামনে থেকে, পা পিছলে গেছে মাহবুবের। নরম কি একটা জিনিসের ওপর পা-টা পড়েছিল, টের পেল অসীম শূন্যের এক কালো গহ্বরের মধ্যে ছিটকে যাচ্ছে সে।

উন্মাদের মত হাত বাড়াল মাহবুব, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো কব্জি জোড়া, ধরে ফেলেছে রেলিং। নিজেকে গাল দিল একটা।

কিসের ওপর পা দিয়ে পিছলে পড়েছিল মাহবুব? জিনিসটা কি বোঝার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল অন্ধকারে। মাথায় দ্রিম দ্রিম ঢাক বাজছে। হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে এসে ঠেকেছে, প্রচণ্ড ব্যথা করছে হাত।

নরম জিনিসটা খুঁজে পেল মাহবুব। গায়ে আঙুল বুলিয়েই বুঝতে পারল, একটা পুতুল। বিদঘুটে চেহারার বড়সড় এই পুতুলটা সে কিনেছিল তার বাবু সোনার জন্যে।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না মাহবুব। কে যে এভাবে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখে! নাহ্, কাজের বুয়াটা ছুটিতে দেশের বাড়ি গিয়ে মুশকিলই হলো দেখছি। আরেকটু হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হতে যাচ্ছিল মাহবুবের। অত উঁচু থেকে সরাসরি সিমেন্টের মেঝেতে আছড়ে পড়লে বাঁচত নাকি সে? ভাগ্যিস রেলিংটা ধরে ফেলেছিল।

পরদিন, নাস্তার টেবিলে কথাটা বলল শায়লা। 'আমি দিন কয়েকের জন্য একটু বরিশাল যেতে চাই। আব্বা-আম্মাকে দেখি না অনেক দিন। তুমি যদি সময় করতে না পারো, আমাকে একাই যেতে দাও, প্লীজ। জামালের মা বুধবার আসবে দেশের বাড়ি থেকে। সে একাই বাবুর যত্ন নিতে পারবে। আমি ওকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছি না। আসলে বলতে পারো আমি কয়েকদিনের জন্যে ওর কাছ থেকে পালাতে চাইছি। ভেবেছিলাম এই ব্যাপারটা—মানে ভয়টা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু তা আর পারলাম কই? ওর সঙ্গে এক রুমে আর থাকতে পারছি না আমি। ও

এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যেন প্রচণ্ড ঘৃণা করে আমাকে। এভাবে আরও কিছুদিন চললে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব। আমার মন বলছে খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সেটা ঘটার আগেই আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে চাই।'

থমথমে মুখে চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখল মাহবুব। 'তোমার আসলে এখন দরকার একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট। তিনি যদি তোমাকে বাইরে যেতে বলেন তাহলে যেয়ো। কিন্তু এভাবে আর চলে না। তোমার টেনশনেই আমি মরলাম!'

মুখ কালো হয়ে গেল শায়লার। অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকল। তারপর ওর দিকে না চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমিই বোধহয় ঠিক বলেছ। আমাকে একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার। ঠিক আছে, কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই আমি যেতে রাজি, মাহবুব।'

মাহবুব ওর ঠোঁটে চুমু খেলো। 'ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়ে, ডার্লিং। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে কথাটা বলিনি। তুমি তো জানোই, তুমি আমার কাছে কতখানি! তোমার সামান্য কষ্ট হলেও আমি দিশেহারা হয়ে যাই।'

মুখ তুলল শায়লা। হাসল। 'জানি, মাহবুব। আমি কিছু মনে করিনি। যাকগে, আজ ফিরবে কখন?'

'অন্যান্য দিনের মতই। কেন, হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?'

'এমনিই। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরলে আমি একটু স্বস্তি পাই। চারদিকে এত অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আর যে জোরে গাড়ি চালাও, আমার খুব ভয় হয়।'

'ওতো আমি সবসময়ই চালাই। অ্যাক্সিডেন্টে মরব না, একশোভাগ গ্যারান্টি দিলাম।' শায়লার ফর্সা গাল টিপে দিল সে। হাসতে হাসতে বলল, 'চলি,' দৃঢ় পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাহবুব। ফ্রেশ মুড নিয়ে।

অফিসে পৌঁছেই ডাক্তার মোখলেসুর রহমানকে ফোন করল মাহবুব। জানতে চাইল তাঁর জানাশোনা ভাল কোন সাইকিয়াট্রিস্ট আছে কিনা। ডা. সানোয়ারা বেগমের কথা বললেন রহমান সাহেব। অত্যন্ত দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য একজন মনোবিজ্ঞানী। জানালেন ভদ্রমহিলার সঙ্গে তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখবেন, মাহবুবকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল মাহবুব। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর যখন ফ্রী হলো মাহবুব, অনুভব করল বাসায় যাওয়ার জন্যে কি ব্যগ্র হয়ে আছে মন। লিফটে নামার সময় গতরাতের ঘটনাটা মনে পড়ল ওর। শায়লাকে আছাড় খাওয়ার কথা বলেনি সে। পুতুলটার কথা বললে সে যদি অন্যভাবে রিঅ্যাক্ট করে! থাক, দরকার নেই বলার। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।

সূর্য ডুবে গেছে টয়োটা বিল্ডিং-এর আড়ালে। টকটকে লাল আভা ছড়িয়ে আছে ওদিকের আকাশে। সিঁদুর রঙা মেঘগুলো আশ্চর্য সব মূর্তি এঁকে রেখেছে আকাশের বুকে। অপূর্ব! একটা সিগারেট ধরিয়ে ফুরফুরে মেজাজে গাড়ি চালাচ্ছে মাহবুব।

গাড়ি-বারান্দায় টয়োটা রাখল মাহবুব। শায়লাকে নিয়ে এখনই আবার বেরুবে। ঠিক করেছে লং ড্রাইভে গাজীপুরের দিকে যাবে। ফেরার পথে রাতের খাবারটা সেরে নেবে কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে।

হাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল মাহবুব। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। পেছন থেকে মিষ্টি স্বরে ডেকে উঠল একটি পাখি। কলিংবেলে চাপ দিল। পিয়ানোর টুং টাং শব্দ বাজতে শুরু করল দোতলায়। দেড় মিনিট পার হওয়ার পরেও শায়লা আসছে না দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর। ঘুমিয়ে পড়েনি তো শায়লা। কিন্তু এ সময় তো ওর ঘুমাবার কথা নয়। দরজার নবে হাত রাখল মাহবুব। মোচড় দিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। কপালে আরও একটা ভাঁজ পড়ল ওর। সদর দরজা কখনও খোলা রাখে না শায়লা। দিনকাল ভাল নয় জানে। তাহলে হলো কি আজ মেয়েটার।

ঘরে ঢুকেই উঁচু গলায় ডাকল মাহবুব, 'শায়লা!' কোন উত্তর নেই। আবারও ডাকতে গেল, কিন্তু হাঁ হয়েই থাকল মুখ। দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে সে, ভয়ের তীব্র একটা ঠাণ্ডা স্রোত জমিয়ে দিল ওকে।

কিম্ভূত পুতুলটা পড়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। কিন্তু পুতুল নয়, মাহবুব তাকিয়ে আছে শায়লার দিকে। শায়লার হালকাপাতলা দেহটা দুমড়ে মুচড়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। যেন একটা ভাঙা পুতুল, আর কোনদিন খেলা করা যাবে না। কোনদিন না।

মারা গেছে শায়লা।

বাড়িটি আশ্চর্যরকম নিঃশব্দ, শুধু মাহবুবের বুকে হাতুড়ির আঘাত পড়ছে দমাদম।

মারা গেছে শায়লা।

মাথাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরল মাহবুব, স্পর্শ করল চম্পক অঙ্গুলি। ভীষণ ঠাণ্ডা। বুকের সঙ্গে চেপে ধরে থাকল মাহবুব শায়লাকে। কিন্তু ও তো আর বেঁচে উঠবে না, আর কখনও জলতরঙ্গ কণ্ঠে ডাকবে না তার নাম ধরে। বাঁচতে চেয়েছিল শায়লা। তার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ মাহবুব বাঁচাতে পারেনি তার প্রিয়তমাকে, পারেনি নিরাপত্তা দিতে।

উঠে দাঁড়াল ও। ডাক্তার চাচাকে ফোন করতে হবে। কিন্তু নাম্বারটা মনে আসছে না। ভূতগ্রস্তের মত উঠে এল মাহবুব দোতলায়। সম্মোহিত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল নার্সারী রুমের দিকে। খুলল দরজা। পা রাখল ভেতরে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল দোলনার দিকে। পেটের মধ্যেটা গুলিয়ে উঠছে। কোনকিছু ঠাহর করতে পারছে না ভাল মত।

বাচ্চাটা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, কিন্তু মুখখানা লাল, ঘামে চকচক করছে, যেন অনেকক্ষণ একভাবে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'ও মারা গেছে,' ফিসফিস করে বলল মাহবুব। 'মারা গেছে শায়লা।'

তারপর সে হঠাৎ হাসতে শুরু করল। নিচু গলায় হাসতেই থাকল। সংবিৎ ফিরে পেল গালে সজোরে চড় খেয়ে। চমকে উঠল ডাক্তার মোখলেসুর রহমানকে দেখে। তিনি একের পর এক চড় মারছেন ওকে আর চেঁচাচ্ছেন, 'শান্ত হও, মাহবুব।

ইজি, কাম ডাউন!'

'শায়লা মারা গেছে, ডাক্তার চাচা,' মোখলেসুর রহমানকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলল মাহবুব। 'পড়ে গেছে ও দোতলা থেকে পা পিছলে। গত রাতে আমিও পুতুলটার গায়ে পা পিছলে প্রায় মারা যাচ্ছিলাম। আর এখন—'

মোখলেসুর রহমান ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না।

উন্মাদের মত মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল মাহবুব। 'জানেন, ডাক্তার চাচা, আমি ওর সুন্দর একটা নাম দেব ভেবেছিলাম। এখন কি নাম দেব জানেন? আজরাইল!'

রাত এগারোটা। শায়লাকে আজিমপুর গোরস্থানে কবর দিয়ে এসেছে মাহবুব। শুকনো মুখে বসে আছে লাইব্রেরি ঘরে। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে বলল, 'ভেবেছিলাম শায়লাকে ভাল একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাব। ভেবেছিলাম ওর মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু এখন বুঝছি বাচ্চাটাকে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা অমূলক ছিল না।'

ডাক্তার সশব্দে শ্বাস ফেললেন। 'শায়লার মত তুমিও দেখি ছেলেমানুষী শুরু করলে। অসুস্থতার জন্য শায়লা বাচ্চাটাকে দোষ দিত আর এখন তুমি ওর মৃত্যুর জন্যে তাকে দায়ী করছ। খেলনাটার ওপর পা পিছলে দোতলা থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙেছে শায়লার। এ জন্যে তুমি কোন ভাবেই বাচ্চাটাকে অভিযুক্ত করতে পারো না।'

'ওটা আজরাইল।'

'চুপ করো! ওই শব্দটা আর কখনও মুখে আনবে না।'

মাথা নাড়ল মাহবুব। 'শায়লা রাতে অদ্ভুত সব শব্দ শুনত, কে যেন হাঁটছে ঘরে। আপনি জানেন, ডাক্তার চাচা, কে ওই শব্দ করত? বাচ্চাটা। ছয়মাসের একটা বাচ্চা, অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত, আমাদের সব কথা শুনত!' চেয়ারের হ্যাতল চেপে ধরল মাহবুব। 'আর আমি যখন আলো জ্বালাতাম, কিছু চোখে পড়ত না। বাচ্চাটা এত ছোট, যে কোন ফার্নিচারের আড়ালে লুকিয়ে পড়াটা ওর জন্য কোন সমস্যা ছিল না।'

'থামবে তুমি!' বললেন ডাক্তার।

'না চাচা, আমাকে বলতে দিন। সব বলতে না পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি গতবার ব্যবসার কাজে হংকং গেলাম, তখন কে শায়লাকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল, কে তার নিউমোনিয়া বাঁধিয়েছিল? ওই বাচ্চা। কিন্তু এত চেষ্টার পরেও যখন শায়লা মরল না, তখন সে আমাকে খুন করতে চাইল। ব্যাপারটা ছিল স্বাভাবিক; সিঁড়িতে একটা খেলনা ফেলে রাখো, বাপ তোমার জন্যে দুধ না নিয়ে আসা পর্যন্ত কাঁদতে থাকো, তারপর সে অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে ঘাড় ভাঙুক। সাধারণ একটা কৌশল, কিন্তু কাজের। আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি। কিন্তু ফাঁদটা শায়লাকে শেষ করেছে।'

একটু থামল মাহবুব। হাঁপিয়ে গেছে। খানিকপর বলল, 'বহু রাতে আমি আলো জ্বেলে দেখেছি ঘুমায়নি ওটা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বেশিরভাগ শিশু ওই সময় ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু ও জেগে থাকত, চিন্তা করত।'

'বাচ্চারা চিন্তা করতে পারে না।'

'ও পারে। আমরা বাচ্চাদের মন সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি? শায়লাকে ওর ঘৃণা করার কারণও ছিল। শায়লা ওকে মোটেও স্বাভাবিক কোন শিশু ভাবত না। ভাবত অস্বাভাবিক কিছু। ডাক্তার চাচা, আপনি তো জানেনই জন্মের সময় কত বাচ্চা তাদের মায়েদের খুন করে। এই নোংরা পৃথিবীতে জোর করে টেনে আনার ব্যাপারটা কি ওদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে?' মাহবুব ক্লান্তভাবে ডাক্তারের দিকে ঝুঁকল। 'পুরো ব্যাপারটাই এক সুতোয় বাঁধা। মনে করুন, কয়েক লাখ বাচ্চার মধ্যে কয়েকটা জন্মাল অস্বাভাবিক বোধ শক্তি নিয়ে। তারা শুনতে পায়, দেখতে পায়, চিন্তা করতে পারে, পারে হাঁটাচলা করতে। এ যেন পতঙ্গদের মত। পতঙ্গরা জন্মায় স্ব-নির্ভরভাবে। জন্মাবার কয়েক হপ্তার মধ্যে বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু সাধারণ বাচ্চাদের কয়েক বছর লেগে যায় হাঁটতে, চলতে, কথা বলা শিখতে।

'কিংবা ধরুন, কোটিতে যদি একটি বাচ্চা অস্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করে? জন্মাল একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মেধা এবং শক্তি নিয়ে। কিন্তু যে ভান করল আর দশটা বাচ্চার মতই। নিজেকে দুর্বল হিসেবে প্রমাণ করতে চাইল, খিদের সময় তারস্বরে কাঁদল। কিন্তু অন্য সময় অন্ধকার একটা বাড়ির সব জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে সে, শুনছে বাড়ির লোকজনের কথাবার্তা। আর তার পক্ষে সিঁড়ির মাথায় ফাঁদ পেতে রাখা কত সোজা! কত সহজ সারারাত কেঁদে তার মাকে জাগিয়ে রেখে অসুস্থ করে তোলা।'

'ফর গডস শেক!' দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার, উত্তেজিত। 'এসব কি উদ্ভট কথা বলছ তুমি!'

'উদ্ভট শোনালেও ব্যাপারটা সত্যি, ডাক্তার চাচা, মানুষটা ছোট বলেই আমরা ওকে সন্দেহ করতে পারছি না। কিন্তু এই খুদে সৃষ্টিগুলো ভীষণ রকম আত্মকেন্দ্রিক। কেউ ওদের ভাল না বাসলে ঠিকই টের পায়। তখন তাদের প্রতি ওদের ঘৃণা উথলে ওঠে। আপনি কি জানেন ডাক্তার চাচা, পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বার্থপর হচ্ছে শিশুরা?'

মোখলেসুর রহমান ভ্রূকুটি করে অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন।

মাহবুব বলল, 'আমি বলছি না বাচ্চাটার ওপর কোন অস্বাভাবিক শক্তি ভর করেছে। কিন্তু সময়ের আগেই ও যেন দ্রুত বেড়ে উঠেছে। আর এই ব্যাপারটাই আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে।'

ঠাট্টা করতে চাইলেন ডাক্তার। 'ধরো, বাচ্চাটা শায়লাকে খুনই করেছে। কিন্তু খুনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। বাচ্চাটার উদ্দেশ্য কি ছিল?'

জবাবটা তৈরিই ছিল। ত্বরিতগতিতে বলল মাহবুব, 'যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেনি তার সবচেয়ে শান্তির জগৎ কোথায়? তার মায়ের জরায়ু। ওখানে সময় বলে কিছু নেই, আছে শুধু শান্তির অপার সমুদ্র, একমনে গা ভাসিয়ে থাকো। কোন কোলাহল নেই, নেই দুশ্চিন্তা। কিন্তু তাকে যখন জোর করে টেনে আনা হলো এই মাটির পৃথিবীতে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জগৎ থেকে মুহূর্তে সে পতিত হলো এক নরকে। স্বার্থপর এই পৃথিবীতে তাকে বেঁচে থাকতে হলে মানুষের ভালবাসা আদায় করতে

হবে। অথচ যার সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই। পরিচিত জগৎ থেকে হঠাৎ এই অপরিচিত দুনিয়ায় এসে নিজেকে সে প্রচণ্ড অসহায় ভাবতে থাকে, তখন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার ছোট্ট মগজে তখন শুধু স্বার্থপরতা আর ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। মোহময় জগৎ থেকে কে তাকে এই নিষ্ঠুর পরিবেশে নিয়ে এল, ভাবতে থাকে সে! এ জন্য দায়ী কে? অবশ্যই মা। তার অপরিণত মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে তখন মায়ের প্রতি ছড়িয়ে পড়ে প্রবল ঘৃণা। বাপও মায়ের চেয়ে ভাল কিছু নয়। সুতরাং তাকেও ঘৃণা করো। খুন করো দু'জনকেই।'

বাধা দিলেন ডাক্তার। 'তুমি যা বললে এই ব্যাখ্যা যদি সত্যি হত তাহলে পৃথিবীর সব মহিলাই তাদের বাচ্চাদের ভয়াবহ কিছু একটা ভাবত।'

'কেন ভাববে না? আমাদের বাচ্চাটা কি তার জলজ্যান্ত উদাহরণ নয়? হাজার বছরের ডাক্তারী শাস্ত্রের বিশ্বাস তাকে প্রটেক্ট করছে। প্রকৃতিগত ভাবে সবার ধারণা সে খুব অসহায়, কোন কিছুর জন্য দায়ী নয়। কিন্তু এই বাচ্চাটা জন্মেইছে বিপুল ঘৃণা নিয়ে। যত দিন যাচ্ছে ততই প্রবল হয়ে উঠছে তার ঘৃণা। সে রাতে শুয়ে থাকে দোলনায়, ফর্সা টুকটুকে মুখখানা ভেজা, শ্বাস ফেলতে পারছে না। অনেকক্ষণ কেঁদেছে বলে এই অবস্থা? অবশ্যই নয়। সে দোলনা থেকে নেমেছে, হামাগুড়ি দিয়ে বেড়িয়েছে সারা ঘরে। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও আমার শায়লাকে খুন করেছে। আমিও ওকে খুন করব।'

ডাক্তার মাহবুবের দিকে এক গ্লাস পানি আর কয়েকটা সাদা বড়ি এগিয়ে দিলেন। 'তুমি কাউকে খুন করবে না। তুমি এখন আগামী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘুমাবে। নাও, এগুলো গিলে ফেলো। একটা ভাল ঘুম হলেই এসব উদ্ভট চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়ে যাবে।'

মাহবুব পানি দিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলল ঘুমের বড়িগুলো। ওপরে উঠল ও। কাঁদছে। শুয়ে পড়ল বিছানায়। মোখলেসুর রহমান ওর ঘুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর চলে গেলেন।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে মাহবুবের, এই সময় শব্দটা শুনল।

'কে?' অস্পষ্ট গলায় বলল সে।

কে যেন হলঘরে ঢুকেছে।

ঘুমিয়ে পড়ল মাহবুব।

পরদিন খুব ভোরে মাহবুবের বাসায় হাজির হলেন ডাক্তার মোখলেসুর রহমান। মাহবুবকে নিয়ে খুব টেনশনে আছেন তিনি। ছোটবেলা থেকে ওকে চেনেন। আবেগপ্রবণ, অস্থির। ভাগ্যিস গত রাতে তিনি ওদের বাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ড্রপ করেছিলেন। নইলে ছেলেটা শায়লার শোকে ওভাবে হাসতে হাসতে পাগল হয়ে যেত। শায়লার কথা মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। এত লক্ষ্মী একটা মেয়ে! কি চমৎকার সুখের জীবন ছিল ওদের। সব গেল ছারখার হয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। মাহবুবকে তিনি কিছু দিনের জন্যে দূরে কোথাও ঘুরে আসতে বলবেন। এভাবে একা থাকলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে ছেলেটার।

কলিংবেল বাজালেন ডাক্তার। কোন উত্তর নেই। তাঁর মনে পড়ল মাহবুব বলেছিল কাজের মহিলা দেশের বাড়িতে গেছে। নব ঘোরালেন তিনি। খুলে গেল

দরজা। ভেতরে ঢুকলেন। ডাক্তারি ব্যাগটা রাখলেন কাছের একটা চেয়ারে।

সাদামত কি একটা সরে গেল দোতলার সিঁড়ি থেকে। মোখলেসুর রহমান প্রায় খেয়ালই করলেন না। তাঁর নাক কুঁচকে উঠেছে। কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছেন।

গন্ধটা গ্যাসের!

বিদ্যুৎ খেলে গেল ডাক্তারের শরীরে, ঝড়ের বেগে সিঁড়ি টপকালেন, ছুটলেন মাহবুবদের বেডরুম লক্ষ্য করে।

বিছানায় নিশ্চল পড়ে আছে মাহবুব, সারা রুম ভরে আছে গ্যাসে। দরজার পাশের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো অগ্নিনির্বাপক গ্যাস সিলিন্ডারের মুখ খোলা। হিসহিস শব্দে বেরিয়ে আসছে সাদা পদার্থটা। মোখলেসুর রহমানের চকিতে মনে পড়ল মাহবুব একবার বলেছিল সে তার বেডরুমে অগ্নিনির্বাপক গ্যাস সিলিন্ডার লাগিয়েছে। কারণ তার কোন এক বন্ধু নাকি বিছানায় শুয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে নেটের মশারিতে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরার জোগাড় হয়েছিল। মাহবুবেরও শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। শায়লার তাগিদেই নাকি সে নিরাপত্তার জন্যে ওই সিলিন্ডার লাগিয়েছে দেয়ালে।

মোখলেসুর রহমান দ্রুত সিলিন্ডারের মুখ বন্ধ করলেন। বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিলেন। তারপর দৌড়ে এলেন মাহবুবের কাছে।

ঠাণ্ডা হয়ে আছে শরীর। অনেক আগেই মারা গেছে মাহবুব।

কাশতে কাশতে ঘর থেকে বেরোলেন ডাক্তার। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় পানি ঝরছে। মাহবুব কিছুতেই ওই সিলিন্ডারের মুখ খোলেনি। ঘুমের মধ্যে ওর হাঁটার অভ্যাস আছে, বলেছিল শায়লা। কিন্তু যে পরিমাণ ঘুমের ওষুধ ডাক্তার ওকে খাইয়েছেন তাতে দুপুর পর্যন্ত মাহবুবের অঘোরে ঘুমাবার কথা। সুতরাং এটা আত্মহত্যাও হতে পারে না। তাহলে কি…!

হলঘরে মিনিট পাঁচেক পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার মোখলেসুর রহমান। তারপর এগোলেন নার্সারী রুমের দিকে। দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিয়ে খুললেন তিনি দরজা। দাঁড়ালেন দোলনার পাশে।

দোলনাটা খালি।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার দোলনা ধরে। তারপর অদৃশ্য কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন:

'নার্সারীর দরজাটা বন্ধ ছিল। তাই তুমি তোমার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান দোলনাতে ফিরে আসতে পারোনি। তুমি বুঝতে পারোনি যে বাতাসের ধাক্কায় দরজাটা অমন শক্ত ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি জানি তুমি এই বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছ। ভান করছ এমন কিছুর, আসলে যা তুমি নও।' মাথার চুল খামচে ধরলেন ডাক্তার, বিবর্ণ একটুকরো হাসি ফুটল মুখে। 'আমি এখন শায়লা আর মাহবুবের মত কথা বলছি, তাই না? কিন্তু আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। আমি অপার্থিব কোন কিছুতে বিশ্বাস করি না। তারপরও আমি কোন ঝুঁকি নেব না।'

নিচে নেমে এলেন ডাক্তার। চেয়ারে রাখা ডাক্তারি ব্যাগ খুলে একটা যন্ত্র বের করলেন।

হলঘরে ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ শোনা গেল। কে যে ঘষটে ঘষটে আসছে এদিকে, পাঁই করে ঘুরলেন ডাক্তার।

আমি তোমাকে এই দুনিয়ায় এনেছি, ভাবলেন তিনি। আর এখন আমিই তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেব···!

শব্দ লক্ষ্য করে ঠিক ছ'পা হেঁটে গেলেন ডাক্তার। হাতটা উঁচু করে ধরলেন সূর্যালোকে।

'দেখো বাবু! কি চকমকে, কি সুন্দর!'

সূর্যের আলোতে ঝিকিয়ে উঠল স্কালপেলটা।

ঘুণপোকা

সবসময় একইভাবে ব্যাপারটা শুরু হয়। প্রথমেই সেই শিরশিরে অনুভূতি।

খুলির ঠিক মাঝখানটায় ছোট্ট কোন পোকা নড়াচড়া করলে কেমন লাগবে আপনাদের? পোকাটা যদি খালি এগোয় আর পেছোয় ওখানটায়, তাহলে?

এটার শুরুও তেমনিভাবে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন না খুলির ওপরে কে হাঁটছে। শুধু অনুভব করতে পারছেন জিনিসটা নড়ছে। যদি ভেবে থাকেন মাথায় আচমকা আঙুল চালিয়ে ওকে ধরবেন, পারবেন না। স্যাৎ করে সরে যাবে।

আপনি ওই শিরশিরে স্পর্শকে ভুলে থাকতে চাইছেন? চেষ্টা করেই দেখুন না পারেন কি না। সে আপনাকে জ্বালিয়ে মারবে। খুলি বেয়ে নেমে আসবে ঘাড়ে। তারপর শুরু হবে সেই ভয়াবহ ফিসফিস।

আপনি তার শরীরটা অনুভব করতে পারছেন। ছোট্ট, ঠাণ্ডা। খুলির ওপর চেপে বসে আছে। পাচ্ছেন ধারাল নখের স্পর্শ। সব সময় অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি আপনাকে গ্রাস করে আছে। চাইলেও পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব না। সে আপনার কানের কাছে ফিসফিস শুরু করবে, শুনতেই হবে তার কথা। খবরদার, তাকে অবহেলার কথা ভুলেও ভাববেন না। সে জানে কিভাবে কথা শোনাতে হয়। সে জানে কিভাবে ভয় দেখাতে হয়। আর আপনি না জানলেও আমি জানি তার কথা না শোনার পরিণতি কত নির্মম আর ভয়ঙ্কর।

'গরীব মানুষ আমি। কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। থাকি জলার ধারে ছোট্ট একটি কুটিরে। গ্রামের লোকজন পছন্দ করে না আমাকে। তরুণীরা তো দেখতেই পারে না দু'চোখে। বলে আমাকে নাকি 'কাকতাড়ুয়া'র মত লাগে। তা বলে বলুক। আমি তো আর তাদের প্রেম পিয়াসী হতে যাচ্ছি না। ওদের কাছে যাওয়ার দরকারটাই বা কি? আসলে গ্রামের লোকজনের সাথে যোগাযোগই নেই আমার। যোগাযোগের প্রয়োজনটাই বা কি? আমার যা কিছু দরকার সবই তো এনে দেয় 'সে'। বিনিময়ে তার জন্য কাজ করে দিতে হয়।

কি কাজ?

মানুষ খুন···

কি, চমকে উঠলেন?

হ্যাঁ, আমি মানুষ খুন করি।

না করে উপায় নেই। কারণ সে যা চায় আমাকে তা করতেই হয়।

সে আমাকে নির্দেশ দেয়। আমি সেটা পালন করি। তার নির্দেশে কখনও কোন ভুল থাকে না। এই তো সেদিন সে আমাকে জানাল—খাটো, মোটা, ধূসর রঙের সোয়েটার আর নীল ওভারঅল পরা যে লোকটা এলিসওর্দির রাস্তাটা ধরে আসছে তার নাম মাইক এবং সে দশ মিনিটের মধ্যে জলার দিকে মোড় নেবে যখন সূর্য

ডুবতে শুরু করবে। বড় গাছটার নিচে এসে বিশ্রাম নেবে। তারপর জ্বালানী কাঠ খুঁজবে আমাকে বলা হয়েছিল টাঙ্গি নিয়ে গাছটার আড়ালে দাঁড়াতে। তার বর্ণনামাফিক সব মিলে গেল। কোন ঝামেলাই হয়নি এক কোপে লোকটার ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দিতে। কাজটা করে নিশ্চিন্তে ফিরে এসেছি। জানি আমাকে কখনও ঝামেলায় ফেলবে না সে, ফেলেওনি কখনও। এভাবেই চলে আসছিল সব কিছু। নির্বিঘ্নে কেটে যাচ্ছিল দিন। কেউ কিছুটি টের পায়নি। কিন্তু সবকিছু ভজঘট হয়ে গেল সেদিন সন্ধ্যায়। বিপর্যয় নেমে এল। বিপদে পড়লাম প্রথমবারের মত।

সন্ধ্যা নেমেছে অনেকক্ষণ। রাতের খাবারটা সেরে নিচ্ছি। এমন সময় তার ফিসফিস শুরু হলো কানের পাশে। 'মেয়েটি আসছে তোমার কাছে। অপূর্ব সুন্দর একটি মেয়ে। অদ্ভুত তার করোটির গঠন। অপূর্ব!'

ভাবলাম সে বুঝি আমার পুরস্কার-এর কথা বলছে। এর আগেও আমি সুন্দরী মেয়েদের পেয়েছি তার বদান্যতায়। তবে সে এক অন্যজগতে, যে পৃথিবী একান্তই আমার। আপনারা জানেন না এই মাটির পৃথিবী ছাড়াও অন্যভুবন আছে যেখানে আমিই রাজা। যেখানে সে আমাকে নিয়ে যায় কখনও কখনও। কিন্তু এবারের ব্যাপার আলাদা। অন্যভুবন নয়, এই ভুবনেরই রক্তমাংসের একজন রমণী আসছে আমার কাছে।

'সে তোমার কাছে এসে সাহায্য চাইবে তার নষ্ট গাড়িটা ঠিক করার জন্য। শর্টকাট রুটে শহরে যাওয়ার ইচ্ছে মেয়েটার। জলার ভেতর পড়ে গেছে গাড়িটা। ওটার একটা চাকা পাল্টানো দরকার।' যান্ত্রিক গাড়ি সম্পর্কে তার এ ধরনের কথা শুনতে আপাতঃদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হলেও এটা ঠিক, এসব সম্পর্কে জানে সে। তার অজানা কিছুই নেই।

'তুমি তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবে, ওর সাথে যাবে। সঙ্গে কিছু নেয়ার দরকার নেই। গাড়ির ভেতর একটা রেঞ্চ পাবে। ওটা দিয়েই সেরে ফেলো কাজটা।'

আমি গাইগুঁই শুরু করলাম। আমার অনীহা দেখে হাসল সে। জানাল তার কথার অবাধ্য হলে কি দশা হবে আমার। বারবার একই কথা বলতে লাগল।

'ভাল চাও তো যা বলি করো। নয়তো আমি তোমাকে…'

'না!' চিৎকার করে উঠলাম। 'করব, আমি করব।'

'তুমি জানো,' সে ফিসফিস করে বলতে শুরু করল, 'আমি ভাল থাকলে, সুস্থ আর সজীব থাকলে, তুমিও ভাল থাকবে। যা চাইবে পাবে। এজন্যই আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে। যা করতে বলব করতে হবে। বোঝা গেছে?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

অল্পক্ষণ পরে মেয়েটি এসে দরজায় কড়া নাড়ল। খুললাম দরজা। বর্ণনার সাথে মিলে গেল মেয়েটির চেহারা। ভারী সুন্দরী। ঝলমলে একমাথা সোনালি চুল। ঠিক আমার মনের মত। সোনালি চুল ভালবাসি আমি। ভাবতে ভাল লাগল এই কেশরাজি নিজের হাতে নষ্ট করতে হবে না। এগোলাম মেয়েটির সাথে। জলার ধারে। ঠিক ঘাড়ে আঘাত করলাম রেঞ্চটা দিয়ে, যেভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এরপরের কাজগুলো রুটিন মাফিক ঘটল। তার নির্দেশে মেয়েটির দেহ

চোরাবালিতে রাখলাম। সে আমাকে বলল পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলতে। মুছলাম। চিন্তা ছিল গাড়িটা নিয়ে। কিন্তু সে আমাকে উপায় বাতলাল কিভাবে গাড়িটাকে চোরাবালিতে অদৃশ্য করা যায়। গাড়িটা ডুবে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। রেঞ্চটাকেও ছুঁড়ে মারলাম। অবশেষে আমাকে রেহাই দিল সে। বলল বাড়ির পথ ধরতে। স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে ফিরে এলাম ঘরে। মাথার ওপর সেই চিরস্থায়ী ও অস্বস্তিকর ওজনটা নেই। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন সে ওই ঝলমলে চুলের মেয়েটিকে নিয়ে ব্যস্ত। ঝিরঝির করে নেমে এল দুচোখে ঘুম। আহ্…ঘুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারব না। কিন্তু ঘুমের মধ্যে টের পেলাম সে ফিরে এসেছে এবং কোথাও কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে। এই অনুভূতি আমাকে দ্রুত জাগাতে শুরু করল।

দরজায় কার যেন অনবরত ধাক্কার শব্দ শুনে ঘুমের রেশ পুরোপুরি কেটে গেল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম। দরজা খুলব কি খুলব না ভাবছি। কিন্তু তার তরফ থেকে কোন পরামর্শ এল না। কারণ সে এখন ঘুমে বিভোর। জলা থেকে ফিরে আসার পর সবসময় এমনি পড়ে পড়ে ঘুমোয় সে। এবং যতক্ষণ ঘুমোয়, আমি নিশ্চিন্তবোধ করি। নিজেকে স্বাধীন মনে হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল না। তার পরামর্শ দরকার ছিল। কিন্তু যতক্ষণ ঘুমোবে সে, আমার পক্ষে তাকে জাগাবার সাধ্য নেই। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না, কারণ দরজায় ধাক্কাটা এখন আরও জোরেসোরে হচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দরজা খুলতে দেখি বুড়ো শেরিফ শেলবি দাঁড়িয়ে।

'এই যে সেথ,' কোন ভূমিকা ছাড়াই শুরু করল শেরিফ। 'তোমাকে আমি জেলে ভরার জন্য এসেছি।'

মুখে কোন কথা জোগাল না আমার। বুড়োর ছোট, উজ্জ্বল চোখ দুটো কুটিরের চারদিকে ঘুরছে। ইচ্ছে করল পালিয়ে যাই। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম কোথাও মস্ত ভজকট হয়ে গেছে। নইলে বুড়ো এখানে কেন?

'মেয়েটির নাম এমিলি রবিনস,' গড়গড় করে বলছে শেরিফ। 'লোকে বলছে, তাকে নাকি দেখা গেছে এই জলার দিকে আসতে। আমরা ওর গাড়ির চাকার দাগ অনুসরণ করেছি। পুরানো চোরাবালিটার কাছে এসে ওই চিহ্ন গায়েব হয়ে গেছে।'

শিউরে উঠলাম। সে তাহলে ওই দাগ মুছতে ভুলে গেছে! এখন কি হবে?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো শেরিফের, বলল, 'তোমার কোন কথাই আমরা বিশ্বাস করছি না, সেথ। আগে বাড়ো।'

না যাওয়া ছাড়া এ মুহূর্তে বিকল্প কোন উপায় নেই আমার। কারণ ভালয় ভালয় না গেলে বুড়ো জোর খাটাবে। আর আমার কোন কথাও শুনতে চাইবে না। শহরে পৌঁছুতে একটা জটলার সামনে পড়লাম। জনতা মারমুখী হয়ে উঠল আমাকে দেখে। বিশেষ করে মেয়েরা। কিন্তু শেরিফ আমাকে বাঁচাল। নিরাপদেই পৌঁছে গেলাম জেল হাউসে। মিড্ল সেলে সে আমাকে তালা মেরে আটকে রাখল। মিড্ল সেলের পাশাপাশি সেল দুটোকে দেখলাম খালি পড়ে আছে। একা মনে হলো

নিজেকে। না, একেবারে একা নই, সে আছে আমার সাথে। খুলির ভেতর, ঘাপটি মেরে ঘুমোচ্ছে এখনও।

শেরিফ শেলবি আমাকে আটকে রেখে অনেকক্ষণ হলো বাইরে গেছে। সম্ভবত চোরাবালি থেকে দেহটা উদ্ধার করতে। শেরিফ আমাকে এ সম্পর্কে এখনও একটা প্রশ্নও করেনি বলে অবাক লাগছে। চুপচাপ বসে আছি। এই সময় চার্লি পটার এল আমার জন্য নাস্তা নিয়ে। শেরিফ এই লোকটাকে কিছুক্ষণের জন্য দায়িত্ব দিয়ে গেছে। কিন্তু চার্লি পটার শেরিফের মত নয়। সে আমার কাছে সবকিছু জানতে চাইল। কিন্তু তাকে কি বলব আমি? বললে বিশ্বাস করবে? সে তো অনেক আগেই আমাকে পাগল ঠাউরে বসে আছে। শুধু সে নয়, শহরের বেশিরভাগ লোকের বদ্ধমূল ধারণা আমি একটা উন্মাদ। আমার মায়ের কারণেই সম্ভবত এই উপাধিটা পেয়েছি। তাছাড়া একাকী জলার ধারে বাস করাটাও একটা কারণ বটে। চার্লিকে যদি, 'তার' সম্পর্কে বলি, বিশ্বাসই করবে না। সুতরাং বেহুদা কথা বলে লাভ নেই ভেবে চুপ করে বসে থাকাটাই যুক্তি সঙ্গত মনে হলো। কিন্তু চার্লি পটার বকবক শুরু করল। জানাল কিভাবে এমিলি রবিনসকে খোঁজাখুঁজি চলছে আর কিভাবেই বা শেরিফের মনে সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে এর আগে আরও কয়েকজনের এভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে। আমাকে দেখার জন্য নাকি একজন ডাক্তার আসছেন, তাকে কাউন্টি সিট থেকে পাঠানো হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অনুমতিক্রমে। স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিও নাকি আসবেন। বুঝলাম বড়সড় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আমাকে নিয়ে।

নাস্তা শেষ করার পরপরই ডাক্তার ভদ্রলোক এলেন। চার্লি নিয়ে এল তাঁকে। ছোটখাট চেহারার ছাগুলে দাড়ির এই ভদ্রলোক এসেই চার্লিকে পাঠিয়ে দিলেন অফিসে আর সেলের বাইরে বসলেন আমার সাথে কথা বলতে। ভদ্রলোকের নাম ডা. সিলভারস্মিথ। তিনি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার মায়ের ব্যাপারে আসলে কি ঘটেছিল? তাঁর প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হলো উনি আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন। ফলে তাঁর সাথে কথা বলা সহজ হয়ে দাঁড়াল।

'মা আর আমি বহুদিন ধরে ওই কুঁড়েঘরে ছিলাম। মা তামাক বানিয়ে বিক্রি করত। রাতে আমরা একটা বড় পাত্রে ওষধি তৈরি করতাম। মা আমাকে একা রেখে রাতে ঘর ছেড়ে বেরুতেন।'

এ পর্যন্ত বলে চুপ করে রইলাম। কিন্তু ডাক্তার সবই জানতেন আমার সম্পর্কে। তিনি জানতেন লোকে আমার মাকে ডাইনী বলত। এমনকি উনি সেদিনের কথাও জানেন, যেদিন মা মারা গেল। সেদিন সন্ধ্যায় সান্তো ডিনোরেলি আমাদের ঘরে এসে মাকে ছুরি মারল, কারণ আমার মা নাকি তার মেয়েকে বিষ তৈরি করে দিয়েছিল এবং সে নাকি পালিয়ে গিয়েছিল সেই ট্র্যাপার ব্যাটার সাথে। আমি যে কুঁড়ে ঘরটায় একা থাকতাম একথাও ডাক্তার জানেন।

কিন্তু তিনি ঘুণপোকা সম্পর্কে জানেন না।

ঘুণপোকা: যে আমার খুলির ওপর, চুলের মধ্যে ঘাপটি মেরে ঘুমিয়ে কাদা, এখনও কিছুই জানে না আমাকে নিয়ে কি ঘটছে না ঘটছে।

ডাক্তার সিলভার স্মিথকে আমি ঘুণপোকা সম্পর্কে বললাম। ব্যাখ্যা করার

চেষ্টা করলাম ওই মেয়েটিকে যে খুন করেছে সে আমি নই। ফলে ঘুণপোকার প্রসঙ্গ এল। তাঁকে জানালাম কিভাবে আমার মা আমার শরীর থেকে কিছু রক্ত বোতলে নিয়ে একদিন রাতে জঙ্গলে গিয়েছিল এবং যখন সে ফিরে আসে তাঁর সাথে ছিল এই ঘুণপোকা। মা পোকাটাকে আমার সকল দেখাশোনার ভার দিয়েছিল। তখন আমার বয়স মাত্র বারো। মা জানত ঘুণপোকা আমাকে দেখেশুনে রাখবে। এভাবেই তার সাথে চুক্তি হয়েছিল। সেই থেকে ঘুণপোকা আমার সাথে আছে এবং সে যা বলে আমি তা শুনি।

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছিলাম ডাক্তারের কাছে, এই আশায় যে উনি আমাকে বুঝতে পারবেন, বিশ্বাস করবেন কথাগুলো।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল। কথা বলার সময়ই বুঝতে পারলাম। কারণ আমার কথায় 'হুঁ-হ্যাঁ' করে সায় দেয়ার সময় তাঁর চোখ আমার মুখের ওপর ঘুরছে এবং সেই চোখে এমন দৃষ্টি—বেশিরভাগ মানুষ যখন আমাকে পাগল ভেবে ঠাট্টার দৃষ্টিতে তাকায়, তেমনি।

ডাক্তার এরপর নিতান্তই হাস্যকর কিছু প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমি ঘুণপোকাকে যদি চোখে দেখতে না-ই পাই তাহলে তার কথা শুনি কিভাবে? জানতে চাইলেন এ ধরনের আর কারও কণ্ঠ আগে কখনও শুনেছি কি না। জিজ্ঞেস করলেন এমিলি রবিনসকে হত্যা করার সময় কেমন লেগেছিল। এমনভাবে তিনি প্রশ্নগুলো করলেন যেন সত্যিই আমি একটা বদ্ধ পাগল এবং খুনে। জানতে চাইলেন, আরও যে সব লোককে আমি খুন করেছি তাদের মাথাগুলো কোথায় রেখেছি? আমি তাঁর এসব প্রশ্নের একটারও জবাব দিলাম না। শেষমেষ হাল ছেড়ে দিলেন তিনি। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন। আমি তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলাম। উনি আসলে আমার কাছ থেকে খুনের স্বীকারোক্তি নিতে এসেছিলেন।

বিকেলে ঘুম ভাঙল আমার। তাকিয়ে দেখি সেলের সামনে নতুন একজন লোক দাঁড়িয়ে। আমাকে জাগতে দেখে মোটা লোকটির চোখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

'হ্যালো, সেথ,' আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'ঘুম ভাল হয়েছে তো?' আমি মাথা নাড়লাম। ঘুণপোকার জেগে ওঠার কোন আলামত পাচ্ছি না। সে এখনও গভীর ঘুমে মশগুল। সে যখন ঘুমায় তখনও তার শরীর নড়তে থাকে দ্রুত।

'আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' বললেন তিনি। 'আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি।'

'আপনাকে কি ওই ডাক্তার পাঠিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ভদ্রলোকটি হাসলেন। 'অবশ্যই না। আমার নাম ক্যাসিডি। এডউইন ক্যাসিডি। আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। আপাতত এখানকার চার্জে আছি। ভেতরে আসব? কথা বলতে পারি তোমার সাথে?'

'কিন্তু আমাকে তো তালা দিয়ে রাখা হয়েছে।'

'অসুবিধে নেই। শেরিফের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসেছি,' বললেন মি. ক্যাসিডি। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। বসলেন আমার পাশের চৌকিতে।

'ভয় করছে না আপনার?' বললাম আমি। 'জানেনই তো আমাকে একজন

হত্যাকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে।'

'না, সেথ,' উনি হাসলেন। 'তোমাকে ভয় পাচ্ছি না। আমি জানি তুমি কাউকে খুনটুন করোনি।' তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। নরম, মোটা আর আন্তরিক হাত। আঙুলের বড় আংটিটা থেকে হীরে ঝিকিয়ে উঠল। আমি হাতটা সরালাম না।

'ঘুণপোকা কেমন আছে?' মোলায়েম স্বরে জানতে চাইলেন তিনি।

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেথ! ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। ওই বোকা ডাক্তারটা ওর সম্পর্কে বলছিল, রাস্তায় দেখা হওয়ার সময়। ব্যাটা ঘুণপোকা বলে কিছু আছে বিশ্বাসই করে না। কিন্তু আমি আর তুমি করি, তাই না, সেথ?'

'ওই ডাক্তারটার ধারণা আমি একটা পাগল,' ফিসফিস করে বললাম।

'আরে বাদ দাও ওর কথা। শুনে প্রথমে অবশ্য বিশ্বাস করতে একটু কষ্টই হয়। সে যাকগে, আমি এইমাত্র ওই জলার ধার থেকে এসেছি। শেরিফ আর তাঁর লোকেরা এখনও কাজে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ আগে ওরা এমিলি রবিনসের দেহটা খুঁজে পেয়েছে। সাথে আরও কিছু লাশ। এদের মধ্যে একজন মোটাসোটা লোক, একটা ছোট ছেলে আর কয়েকজন ইন্ডিয়ান। সবগুলো শরীরই চোরাবালিতে ডুবে ছিল।'

আমি তাঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকালাম। হাসছে। মনে হলো এই লোককে বিশ্বাস করে সব বলা যায়।

'ওরা খোঁজাখুঁজি করলে আরও কিছু লাশের সন্ধান পাবে, তাই না, সেথ?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

'আমি ওখানে বেশিক্ষণ থাকিনি। যা দেখেছি তাতেই ধারণা হয়েছে তোমার কথা সত্যি। ঘুণপোকা তোমাকে ওই কাজগুলো করতে বাধ্য করেছিল, তাই না?'

আমি আবারও মাথা ঝাঁকালাম।

'চমৎকার।' আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন মি. ক্যাসিডি। 'বুঝতেই পারছ আমরা একে অপরকে এখন বোঝার চেষ্টা করছি। সুতরাং তুমি নির্দ্বিধায় সব কথা খুলে বলতে পারো। কোন দোষ দেব না তোমায়।'

'কি জানতে চান আপনি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অনেক কিছু। আমি ঘুণপোকা সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। সে তোমাকে দিয়ে এ পর্যন্ত ক'জন লোককে খুন করিয়েছে?'

'নয়জন।'

'সবাইকে কি ওই চোরাবালিতে কবর দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ওদের নাম জানো?'

'মাত্র কয়েকজনের।' আমার জানা নামগুলো বললাম।

'মাঝে মাঝে ঘুণপোকা আমাকে শুধু তাদের বর্ণনা দিত, আর আমি গিয়ে খুন করে আসতাম।'

মি. ক্যাসিডি একটু মুচকি হেসে পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন।

আমি কটমট করে তাকালাম।

'সিগারেট খেলে তোমার অসুবিধে হবে, সেথ?'

'প্লীজ—আমি ধূমপান পছন্দ করি না। আমার মা-ও পছন্দ করতেন না। তিনি কখনোই আমাকে ধূমপান করতে দেননি।'

মি. ক্যাসিডি জোরে হেসে উঠলেন। সিগারেটটা সরিয়ে রেখে ঝুঁকলেন সামনে। 'তুমি আমাকে বড় ধরনের সাহায্য করতে পারো, সেথ,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'আশা করি জানো একজন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দায়িত্ব কি?'

'তিনি আইনজীবী, ট্রায়ালের দিকটা দেখাশোনা করেন, নাকি?'

'ঠিক। আমি তোমার ট্রায়ালের ভার নিচ্ছি, সেথ। তুমি এখন নিশ্চয়ই সবার সামনে বলে বেড়াবে না কি কি ঘটেছে—ঠিক?'

'না, মি. ক্যাসিডি, আমি তা করব না। জানি এই শহরের লোকেরা আমাকে দেখতে পারে না। ঘৃণা করে।'

'তাহলে তোমার এখন কর্তব্য হচ্ছে কোন লুকোছাপা না করে সব কিছু আমাকে খুলে বলা, ঠিক আছে?'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ভাবলাম ঘুণপোকা বুঝি কোন পরামর্শ দেবে। কিন্তু সে এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি মনস্থির করে ফেললাম। 'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'আমি আপনাকে সব বলব।'

তারপর আমি তাকে আমার যা কিছু গোপন ছিল সব খুলে বললাম। শুনতে শুনতে তার মুখের মৃদু হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও মনোযোগী শ্রোতা হয়ে উঠলেন।

'একটা কথা,' বললেন তিনি, 'জলায় আমরা বেশ কিছু মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছি। এমিলি রবিনস সহ কয়েকজনকে চিনতেও পেরেছি। কিন্তু ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যাবে যদি আমরা আরও কিছু জানতে পারি। তুমি আমাকে সেটাই বলবে, সেথ। মাথাগুলো কোথায়?'

আমি উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম। 'সেটা আমি আপনাকে বলতে পারব না। কারণ আমি জানি না।'

'জানো না?'

'আমি সেগুলো ঘুণপোকাকে দেই। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না। এ জন্যই আমাকে খুন করতে হয়েছে। ঘুণপোকার দরকারই তো ওই মাথাগুলো।'

মি. ক্যাসিডিকে বিমূঢ় দেখাল এবার।

'সে সবসময় আমাকে ধড় থেকে মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করে দিতে বলে। তারপর সেখান থেকে চলে যাই মুণ্ডুহীন দেহটাকে চোরাবালিতে ডুবিয়ে রেখে। আমাকে সে ঘুম পাড়ায়। তারপর ফিরে যায় সেই কাটা মুণ্ডুর কাছে।'

'ওগুলো দিয়ে সে কি করে, সেথ?'

এবার আমি বেশ বিরক্ত হলাম। 'দেখুন, আপনি আমার আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। সে ওইগুলো দিয়ে কি করে তাও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে?'

মি. ক্যাসিডি শ্বাস টানলেন। 'কিন্তু তুমি কেন ঘুণপোকার জন্য ওসব করো?'

'আমাকে করতেই হয়। কারণ তার কথা না শুনলে আমার অবস্থাও ওই কাটামুণ্ডুর মত হবে। সে সব সময় আমাকে ভয় দেখায়। আর সে যা বলে তাই

করে ছাড়ে।'

মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করার সময় লক্ষ করলাম মি. ক্যাসিডি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে বেশ নার্ভাস লাগছে। একদম চুপ। তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম।

'যা যা বলেছি ট্রায়ালের সময় সব আপনি ব্যাখ্যা করবেন।'

তিনি মাথা ঝাঁকালেন। 'তুমি কিংবা আমি কেউই ঘুণপোকা সম্পর্কে ট্রায়ালের সময় কিছু বলতে যাচ্ছি না। এমনকি কেউ জানতেই পারবে না ঘুণপোকা বলে সত্যিই কিছু আছে কি না।'

'কেন?'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, সেথ! তুমি বুঝতে পারছ না ঘুণপোকার কথা শুনলে লোকে তোমাকে কি বলবে? স্রেফ উন্মাদ বলবে। এবং তুমি নিশ্চয়ই তা চাও না?'

'না। কিন্তু আপনি আমাকে কিভাবে সাহায্য করবেন?'

মি. ক্যাসিডি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'ঘুণপোকাকে নিয়ে তুমি খুব আতঙ্কে আছ, তাই না? ঠিক আছে, একটা কাজ করো না কেন, ঘুণপোকাকে আমার কাছে দিয়ে দাও না?'

খাবি খেলাম আমি।

'হ্যাঁ, ঘুণপোকাকে আমার কাছে দিয়ে দাও। ট্রায়াল পর্যন্ত সে আমার কাছেই থাকুক। তারপর থেকে ওর সম্পর্কে তোমাকে আর অহেতুক ভাবতে হবে না। কারণ, ওর দায়িত্বভার থেকে তুমি রেহাই পাবে। সেও সম্ভবত চায় না যে লোকে জানুক সে কি সব অপকর্ম করেছে?'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'কিন্তু ঘুণপোকার খুব রাগ হতে পারে। তার ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। তাই তাকে কিছু না জানিয়ে আপনার কাছে হস্তান্তরও করতে পারি না। আর সে এখন ঘুমাচ্ছে।'

'ঘুমাচ্ছে?'

'হ্যাঁ। আমার খুলির ওপরে। আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন না।'

মি. ক্যাসিডি আমার মাথার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। 'আচ্ছা, ঘুম থেকে উঠলে আমি না হয় ওকে সবকিছু ব্যাখ্যা করব। সবকিছু জানার পর আমি নিশ্চিত সে অখুশি হবে না।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'তবে তাই হোক্। কিন্তু আমাকে আপনার কথা দিতে হবে ওর ওপর ঠিকমত নজর রাখবেন।'

'অবশ্যই।'

'এবং ও যা চাইবে আপনি তা তাকে দিতে বাধ্য থাকবেন।'

'একশোবার।'

'এবং আপনি কাউকে জানাবেন না?'

'কাউকে না।'

'আপনার জানা উচিত সে যা চাইবে তা না দিতে পারলে পরিণামে কি ঘটবে। আপনার কাছ থেকে সে তার প্রাপ্য জোর করে হলেও আদায় করবে, মি.

ক্যাসিডি।'

'তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, সেথ।'

আমি এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। টের পাচ্ছি সে জেগে উঠেছে। এগোচ্ছে আমার কানের দিকে।

'ঘুণপোকা,' মৃদুস্বরে ডাকলাম তাকে। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

সে সঙ্কেত দিল, শুনতে পাচ্ছে।

আমি সবকিছু তাকে ব্যাখ্যা করলাম। বললাম কিভাবে আমি তাকে মি. ক্যাসিডির কাছে হস্তান্তর করতে যাচ্ছি।

ঘুণপোকা কোন কথা বলল না। শুনছে।

মি. ক্যাসিডিও কথা বলছেন না। শুধু মৃদু হাসছেন। সম্ভবত অদৃশ্য কারও সাথে কথা বলার সময় আমার ঠোঁট নড়ছে দেখে উনি সামান্য অবাক হয়েছেন মনে হলো।

'মি. ক্যাসিডির কাছে যাও, ঘুণপোকা,' সবকথা শেষ হওয়ার পর বললাম তাকে। 'এক্ষুণি।'

এবং সে গেল।

অনুভব করলাম সেই চিরস্থায়ী ওজনটা আর মাথার ওপর নেই। 'ওকে আপনি টের পাচ্ছেন, মি. ক্যাসিডি?' জানতে চাইলাম।

'কি—ওহ্, হ্যাঁ! হ্যাঁ,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'ঘুণপোকাকে ঠিকঠাক যত্নআত্তি করবেন।'

'সব সময়।'

'মাথার ওপর কখনও টুপি চাপাবেন না,' সতর্ক করে দিলাম তাকে। 'ঘুণপোকা টুপি পরা পছন্দ করে না।'

'দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, সেথ, আমি এখন যাচ্ছি। বেশ বড় উপকার করলে তুমি আমার। ঘুণপোকার জন্য ভেবো না। ও আমার কাছে ভালই থাকবে। আমি আবার আসব ট্রায়াল সম্পর্কে কথা বলতে। ওই ডাক্তার তোমাকে সবার কাছে পাগল বানাতে চাইছে। তুমি ওকে আগে যা বলেছ সে সব যদি এখন অস্বীকার করো তাহলে সেটা তোমার জন্য ভালই হবে। কারণ ঘুণপোকার সাথে তোমার এখন কোন সম্পর্কই নেই।'

'আপনি যা বলেন, মি. ক্যাসিডি। ঘুণপোকার প্রতি সদয় থাকবেন। দেখবেন সে কোন গোলমাল করবে না।'

আমার সাথে হাত মেলালেন মি. ক্যাসিডি। বেরিয়ে গেলেন সেল ছেড়ে। ঘুণপোকাকে নিয়ে। ওরা যাওয়ার পরপর ক্লান্ত লাগল নিজেকে। সেই সাথে কেমন একটা অস্বস্তি। এখন আমার একটা লম্বা ঘুম দরকার।

ঘুম থেকে জেগে দেখি পৃথিবীতে রাত নেমেছে। বুড়ো চার্লি পটারকে আসতে দেখলাম আমার রাতের খাবার নিয়ে। ওকে দেখে 'হাই' বললাম। লাফিয়ে উঠল সে। ঘুরে দাঁড়াল এদিকে পিঠ করে।

'খুনী!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'জলায় ওরা নটা লাশ খুঁজে পেয়েছে। খুনে উন্মাদ কোথাকার!'

'কেন চার্লি,' আমি বললাম, 'ওভাবে বলছ কেন? আমি তো তোমাকে আমার বন্ধুই ভাবতাম।'

'ফুঃ, পাগলের আবার বন্ধু! আমি এখান থেকে এখুনি চলে যাচ্ছি তোমাকে তালা মেরে রেখে। বুঝলে, ফাঁসি থেকে তোমার নিস্তার নেই। শেরিফ শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন।'

চার্লি সবগুলো বাতি নিভিয়ে তড়িঘড়ি চলে গেল। আমি ওর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সামনের দরজায় তালা মেরে চলে যাচ্ছে।

আমি একা, পুরো একা হয়ে গেলাম সারা জেল হাউসে। জীবনে এই প্রথম ঘুণপোকা ছাড়া সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ সময় কাটছে আমার। মাথার চুলের ভেতর আঙুল ডোবালাম। ওখানটা একেবারে খালি। কোন স্পর্শ নেই, নেই সেই শিরশিরে অনুভূতি। নগ্ন মনে হলো জায়গাটা। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। বাইরে তাকালাম। রাস্তাটা খালি। কোন জনমানিষ্যি নেই। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ঘুণপোকা চাঁদের আলো বড় ভালবাসত। চাঁদনি রাত ওকে ক্ষুধার্ত করে তুলত। ভাবছি এমন মৌ মৌ চাঁদের আলোতে সে কি করছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি জানালার কাছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুটো অবশ লাগল। দরজায় একটা শব্দ হলো না? ঘুরে দাঁড়ালাম। শব্দ পেলাম তালা খুলে যাচ্ছে, তারপরই দেখলাম মি. ক্যাসিডিকে। দৌড়ে আসছেন।

'ওকে আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নাও!' হাঁসফাঁস করছেন ভদ্রলোক। 'দূর করো ওকে!'

'কি হয়েছে?' কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

'ঘুণপোকা—তোমার ওই জিনিসটা—ভেবেছিলাম তুমি একটা পাগল···এখন আমিও পাগল হতে যাচ্ছি··· ওকে ফিরিয়ে নাও!' উত্তেজনায় মি. ক্যাসিডি ঠিকমত কথাও বলতে পারছেন না।

'কেন, মি. ক্যাসিডি! ওকে নিয়ে আবার কি ফ্যাকড়ায় পড়লেন?'

'ওটা আমার মাথার চারদিকে শুধু ঘুরছে। ওকে স্পষ্ট টের পাচ্ছি। জিনিসটা ফিসফিস করে কথাও বলছে! ওর যন্ত্রণায় টিকতে পারছি না!'

'কিন্তু আপনাকে তো অনেক আগেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছি, মি. ক্যাসিডি। ও নিশ্চয়ই কিছু একটা চাইছে, তাই না? যদি চেয়ে থাকে তাহলে সেটা তাকে এনে দেয়াই আপনার দায়িত্ব। কারণ আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন।'

'পারব না। আমি কিছুতেই তার কথায় খুন করতে পারব না। সে আমাকে কখনও বাধ্য করতে পারে না।'

'ও পারবে। করেও ছাড়বে।'

মি. ক্যাসিডি সেলের দরজার গরাদ দুহাতে চেপে ধরলেন। চোখ বিস্ফারিত। প্লীজ সেথ, 'আমার জন্য এটুকু করো। ওকে তুমি ফিরিয়ে নাও। তোমার কাছে রাখো তাড়াতাড়ি!' তাঁর কণ্ঠে আতঙ্ক।

'ঠিক আছে, মি. ক্যাসিডি। ডাকছি আমি ওকে।'

ডাকলাম ঘুণপোকাকে। কোন উত্তর পেলাম না। আবারও ডাকলাম। এবারও সাড়া নেই।

মি. ক্যাসিডি চিৎকার শুরু করলেন। তার অসহায় অবস্থা দেখে আমার কষ্টই হলো। আসলে তিনিও ঘুণপোকার ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেননি বলে এই দশা। আমি জানি ঘুণপোকা যখন ওভাবে কানের কাছে ফিসফিস করে তখন কি ঘটতে পারে। প্রথমে সে খোশামোদ করবে, তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করবে, কাজ না হলে অবশেষে ভয় দেখাবে।

'ওর কথা শোনাই আপনার জন্য ভাল হবে,' আমি পরামর্শ দেয়ার সুরে কথাটা বললাম। 'কাকে খুন করতে বলছে ও?'

মি. ক্যাসিডি আমার কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হলো না। তিনি শুধু চিৎকার করেই যাচ্ছেন। দেখলাম পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করে আমার পাশের সেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। 'আমি পারব না!' হেঁচকি উঠে গেছে তার গলায়। 'আমি পারব না! পারব না!'

'আপনি কি পারবেন না?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হোটেলে গিয়ে ডাক্তার সিলভার স্মিথকে খুন করে তাঁর মাথাটা ঘুণপোকাকে দিতে। আমি এখানেই থাকব, এই সেলে, এখানেই আমি নিরাপদে থাকব। ওই শয়তান, ওরে পাষণ্ড···!' বলতে বলতে তিনি হেঁচড়ে মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেছে, একটানা চিৎকার বেরুচ্ছে। দুহাতে চুল টেনে ছিঁড়ছেন তিনি।

'ও যা চাইছে তাই করুন, মি. ক্যাসিডি!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'না হলে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে। ঘুণপোকা কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না। তাড়াতাড়ি, ওহ্ তাড়াতাড়ি করুন!'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা আর্তনাদ শুনলাম মি. ক্যাসিডির। তারপর সব চুপ। আমি তাকে ডাকলাম। কিন্তু কোন জবাব এল না। এখন কি করার আছে আমার? আমি জানি সবকিছু ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। দর্শক হয়ে বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। চুপচাপ বসে রইলাম। চাঁদ তার মাখন কোমল আলো ছড়াচ্ছে। এই স্নিগ্ধ আলো সবসময়ই ঘুণপোকাকে ভয়ঙ্কর হিংস্র আর উত্তেজিত করে তোলে। আজও তেমনি এক পূর্ণিমা রাত।

হঠাৎ মি. ক্যাসিডি গোঙাতে শুরু করলেন। মৃদু আর গভীর একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছে তার গলা থেকে। শিউরে উঠলাম। অবশেষে ঘটনাটা ঘটতে শুরু করেছে। ঘুণপোকাকে থামানোর সাধ্য এখন কারও নেই। অসহনীয় যন্ত্রণার শব্দটা ঝিঁঝির ডাকের মত একটানা বাজছে। আমি দু'হাতে কান চেপে ধরলাম।

যখন ঘুরলাম, দেখি মি. ক্যাসিডি সেলের গরাদের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছেন। সেই গোঙানির শব্দটা আর নেই। এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা শব্দ ভেসে আসছে। হ্যাঁ, ঠিক তেমনি শব্দটা। এই শব্দের সাথে পরিচিত আমি। জানি শব্দটা আসছে ঘুণপোকার মুখ থেকে। গরুর জাবর কাটার মত জাবর কাটছে সে। ঘড়ঘড় করে শব্দটা আসছে তার মুখ থেকে। তারপরেই খুলি ফাটানোর বিকট শব্দ ভেসে এল। আতঙ্কে আবার শিউরে উঠলাম। এখন চুকচুক করে একটানা শব্দ আসছে। ঘুণপোকা খাচ্ছে! মানুষের মগজ খাওয়ার সময় এই শব্দ আমি শুনেছি আগে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই শব্দের উৎস মি. ক্যাসিডির মাথার ভাঙা খুলি। কিছুক্ষণ পর সব আবার চুপচাপ। উঠে দাঁড়ালাম আমি। এগোলাম পাশের সেলের দিকে। গরাদ

নিয়ে হাত ঢুকিয়ে সহজেই মি. ক্যাসিডির পকেট থেকে জেল হাউসের চাবির গোছা আনা গেল। খুলে ফেললাম নিজের সেলের দরজা। আবার মুক্ত আমি। এখানে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। নেই ঘুণপোকারও। মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম, 'ঘুণপোকা, এসো!' চাঁদের আলোয় এক মুহূর্তের জন্য দেখলাম দৃশ্যটা। লাল, বড় একটা গর্ত মি. ক্যাসিডির মাথায়। নিথর পড়ে রয়েছেন মেঝেতে। তারপরই অনুভব করলাম সেই চিরন্তন বোঝাটা আমার মাথায় চেপে বসেছে। হাঁটতে শুরু করলাম করিডর দিয়ে। জেলের বাইরের দরজাটাও খুলে ফেললাম চাবি দিয়ে। মুক্ত বাতাসে আবার বুকভরে শ্বাস নিলাম। তারপর দৃঢ়পায়ে এগোলাম। ঠিক খুলির ওপর ঘড়ঘড় করে উঠল ঘুণপোকা এইসময়। তৃপ্ত এবং সুখী কণ্ঠ!

নরকে প্রত্যাবর্তন

সেপ্টেম্বর মাসের সন্ধ্যা। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেইন স্ট্রীটে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি আর লেস কিনকেড। লেস হলিউডের একজন সহকারী প্রযোজক। আমি ওরই সহযোগী। আমাদের এই ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য হাওয়া খাওয়া নয়—লেস আমাদের লেটেস্ট ছবির জন্য নতুন মুখ খুঁজছে। শিল্পী বাছাই করার ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে ও। চরিত্রের সাথে খাপ না খেলে, চেহারা মানানসই না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পায় না। ভাড়াটে অভিনেতাদের ওপর আস্থা নেই। তাই প্রায়ই ওর ছবিতে নতুন মুখ দেখতে পায় দর্শক। আর নতুন মুখ খুঁজে বের করার ব্যাপারে লেস একটি প্রতিভা। চরিত্রের সাথে খাপ খায় এমন কাউকে খুঁজে বের করতে প্রয়োজনে দুনিয়া চষে ফেলতেও আপত্তি নেই ওর। গত তিনদিন ধরে আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস শহরটা চষে বেড়াচ্ছি। একটা গ্যাংস্টার ফিল্ম করব, তাই নতুন মুখ খুঁজছি। খুঁজে খুঁজে পেরেশান, অথচ পছন্দসই কাউকে আজকেও চোখে পড়ল না। সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে দু'জনেই খুব ক্লান্ত। পা দুটো ব্যথায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। কোথাও বসে একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়।

'খুব টায়ার্ড লাগছে, ভাই। চলো, সিনেমা হলটাতে ঢুকে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিই,' হাতের ডানধারের সিনেমা হলটার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমার মনের কথাটাই বলল লেস।

টিকেট কেটে ঢুকলাম ভেতরে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ। বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। কোন আগ্রহ অনুভব করলাম না। শরীরটা ঢিলে করে মাথাটা এলিয়ে দিলাম নরম সীটের ওপর। চোখ বোজা অবস্থায় কখন তন্দ্রার মত এসেছিল জানি না, লেসের কনুইয়ের ধাক্কায় জেগে উঠলাম। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলাম ওর দিকে।

'আমার দিকে না, পর্দার দিকে তাকাও,' ফিসফিস করে বলল সে। 'এমন জিনিস দেখেছ কখনও?'

পর্দার দিকে তাকালাম। পরবর্তী কয়েকটা মিনিট রুদ্ধশ্বাসে কেটে গেল। যা দেখলাম তা এককথায়—হরর।

দৃশ্যটায় একটা গ্রামের কবরস্থান দেখা যাচ্ছে। বড় বড় কিছু গাছ ঘিরে আছে জায়গাটা।

পাতার ফাঁক দিয়ে গলে পড়া চাঁদের আলো কবরগুলোর জমাট আঁধারকে আরও ভৌতিক করে তুলেছে। ক্যামেরা ঘুরছে কবরগুলোর ওপর, নতুন একটা কবরের ওপর এসে স্থির হয়ে গেল। হরর ছবিগুলোতে যেমন হয়, ব্যাকগ্রাউন্ডে ভয় ধরানো মিউজিক বাজছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে সুর। আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কবরটার দিকে।

কবরটা নড়ে উঠল!

সেই সাথে নড়ে উঠল কবরের পাশের মাটি। মনে হলো যেন কেউ মাটিটা

খুঁড়ছে। তবে ওপর থেকে নয়, নিচ থেকে। অদৃশ্য একটা হাত যেন দ্রুত খাবলে চলেছে। মাটিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে। দেখতে দেখতে বড় একটা গর্ত তৈরি হয়ে গেল ওখানে। গর্তটা মরা মানুষের বিকট হাঁ-র মত লাগল। মনে হলো কি যেন বেরিয়ে আসছে ওখান থেকে। ধীরে ধীরে গর্তটা থেকে বেরিয়ে আসছে…দুটো হাত, নগ্ন, মাংসহীন।

বুকে হাঁটার ভঙ্গিতে হাত দুটো বেরিয়ে এল। এমন সময় কালো মেঘে ঢাকা পড়ল চাঁদ। অস্পষ্টভাবে দেখলাম বিশাল মাথা এবং চওড়া কাঁধ নিয়ে মানুষের আকৃতির মত কি যেন একটা উঠতে যাচ্ছে। মেঘ সরে গেলেই স্পষ্ট দেখা যাবে সবকিছু। কিন্তু কি ওটা?

মেঘ সরে গেল। হেসে উঠল চাঁদ। মানুষের মত আকৃতিটা উঠে দাঁড়িয়েছে, পেছন ফেরা। ঘুরতে যাচ্ছে, ঘুরল।

চাঁদের আলোয় তার মুখটা দেখলাম আমি। প্রথমে মনে হলো বুঝি কোন বাচ্চার মুখ। না, বাচ্চা নয়, বাচ্চাদের মত দেখতে এক পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। শান্ত মুখ। লম্বা চুল, চওড়া কপাল, আধখানা চাঁদের মত বাঁকানো ভ্রূ। চোখ দুটো বন্ধ। নাক মুখ লম্বাটে। সারা মুখ জুড়ে অপার্থিব শান্ত একটা ভাব। দেখে মনে হলো সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। আর তখনই ঘটনাটা ঘটল।

তার মুখটা বড় হতে শুরু করেছে। চাঁদের আলো উজ্জ্বল হচ্ছে, সেই সাথে চেহারায় খুব দ্রুত কিছু পরিবর্তন শুরু হলো। অশুভ পরিবর্তন।

তার ঠোঁট দুটো চুম্বনের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল, নাক কুঁচকে যাচ্ছে, কপালে ফুটে উঠল অসংখ্য বলিরেখা, চুল ঢেকে গেল চটচটে, আঠাল রসে। ঠিক এই সময় চোখ মেলল সে। তাকাল।

চোখ দুটো বড়, স্থির, জ্বলজ্বলে—ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক। ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মনে হলো আমি যেন স্বয়ং মৃত্যুকে তার অশুভ রূপ নিয়ে দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, যে মৃত্যু জীবনকে গিলে খায়, ধ্বংস করে সুন্দর। মনে হলো এই চোখ পৃথিবীর নয়, নরক থেকে উঠে এসেছে, নারকীয় উল্লাসে ধিকিধিকি জ্বলছে। শিউরে উঠলাম আমি। ভয়ঙ্কর চেহারাটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, হঠাৎ ঢলে পড়ল সামনে। ক্লান্তভাবে শরীরটা টানতে টানতে এগোল পুরানো কবরগুলোর মাঝ দিয়ে। আস্তে আস্তে পৌঁছে গেল কবরস্থানের শেষ মাথায়, রাস্তায়। ধীরে ধীরে তার শরীরটা অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

মোহাবিষ্টের মত বসে আছি আমি। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে দৃশ্যগুলো দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হলো কয়েক যুগ ধরে এখানে বসে আছি। ছবি চলছে। লেস এবং আমি কোন কথা না বলে চুপচাপ দেখে চলেছি।

ছবির কাহিনী এরপর গতানুগতিকভাবে এগুলো। ওই জিন্দালাশ আসলে একজন বিজ্ঞানী। তার স্ত্রীকে এক তরুণ ডাক্তার চুরি করে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানীর অসুস্থতার সুযোগে ডাক্তার তাকে শক্তিশালী মাদক দিয়ে অচেতন করে ফেলে।

ছবির সংলাপ ইংরেজী নয়। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। অভিনেতাদের কাউকেই এর আগে কোন ছবিতে দেখিনি। সবাই অচেনা। ছবির সেটিং এবং

ফটোগ্রাফী দুটোই অস্বাভাবিক মনে হলো। ছবির একটা দৃশ্য—ওই জিন্দালাশ এক প্রেতপূজার অনুষ্ঠানে এখন প্রিস্টের ভূমিকা নিয়েছে···একটা বাচ্চা ছেলে শয়তানের বেদিতে শোয়ানো··· জিন্দালাশের হাতে ঝকঝকে ছুরি, চোখে নারকীয় উল্লাস···সব মিলে আমার কাছে জীবন্ত এবং ভয়ঙ্কর মনে হলো।

ছবিটা শয়তান সাধকদের প্রেতপূজা নিয়ে। জিন্দালাশ শয়তানের দূত। শয়তানের পূজারীরা তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে আসে বলি দেবার জন্যে। তাদের বিশ্বাস এই উৎসর্গের মাধ্যমে তাদের প্রভু শয়তানের আবার পুনর্জন্ম হবে। মেয়েটি যখন জিন্দালাশকে তার স্বামী হিসেবে চিনতে পেরে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, তখন গভীর, ভৌতিক কণ্ঠে সে তার গোপন কথা ফাঁস করে দেয় স্ত্রীর কাছে।

ছবির শেষ দৃশ্য অভিনীত হয় পাহাড়ে, বিরাট এক পূজাবেদির পাদদেশে। জিন্দালাশকে এখানে সেই ডাক্তার এবং তার সঙ্গীরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। বেদির ওপর ছিটকে পড়ে সে, চোখে ঘনিয়ে আসে মৃত্যুর ছায়া, মুখ হাঁ হয়ে যায়, গলা থেকে বেরিয়ে আসে ভৌতিক সুর। শয়তানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে সে। মাটিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, আগুনের দিকে সে টেনে হিঁচড়ে আনে দেহ, আগুনের শিখা ছুঁয়ে ফেলে তাকে, মুখ থেকে এখনও সেই প্রার্থনার সুর বেরিয়ে আসতে থাকে। তার চোখ মাটির দিকে, যেন মিনতি করছে। হঠাৎ মাটি যেন ফাঁক হয়ে যায়, আগুনের বিশাল একটা পিণ্ড লাফিয়ে উঠে গ্রাস করে ফেলে তাকে। লেলিহান শিখার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

ছবি শেষ। প্রেক্ষাগৃহের আলোগুলো জ্বলে উঠল। আমরা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। দর্শকদের মুখেও কথা নেই। সব যেন থ মেরে গেছে। আমার চোখের সামনে এখনও জিন্দালাশের চোখ দুটো ভাসছে, কানে ভেসে আসছে সেই ভয়ঙ্কর প্রার্থনা। যেন নরক থেকে ভেসে আসছিল ওই কণ্ঠ।

লেস আমার সাথে একটা কথাও বলল না। স্পষ্ট বুঝলাম ওর মাথায় এখন জিন্দালাশ ঘুরছে। লেস সোজা ম্যানেজারের রুমের দিকে এগোল। বিনা বাক্যব্যয়ে অনুসরণ করলাম ওকে।

ম্যানেজার ডেস্কের পেছন থেকে ভ্রূ কুঁচকে আমাদের দিকে তাকাল। আমাদের দেখে খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। লেস যখন জানতে চাইল আজকের প্রদর্শিত ছবিটা কোত্থেকে সে জোগাড় করেছে এবং ছবিটার নামই বা কি, মেশিনগানের মত একটানা অভিশাপ বর্ষণ করে মুখ খুলল সে।

ছবির নাম 'নরকে প্রত্যাবর্তন'। ছবিটা ইঙ্গলউড নামে এক সস্তা এজেন্সি ভুল করে পাঠিয়েছে। অথচ পাঠানোর কথা ছিল ওয়েস্টার্ন ছবি। আর এমনই মরণ—ছবির ভাষাটাও ইংরেজী নয়।

ম্যানেজারকে পটিয়েপাটিয়ে আমরা ওই সস্তা এজেন্সির নামটাও জেনে নিলাম। পাঁচ মিনিট পরেই লেস এজেন্সির প্রধানের সাথে ফোনে কথা বলল। পরদিন সকালে গেল বিগ বসের সাথে আলাপ করতে। এবং ওই দিনই আমাকে বলা হলো আমি যেন পত্রিকায় ঘোষণা দেই এই বলে যে, কার্ল জোরলা, অস্ট্রিয়ান ভয়াল ছবির তারকা, বিশেষ তারবার্তার মাধ্যমে জানিয়েছেন তিনি আমাদের নির্মিতব্য ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হয়েছেন এবং খুব শিগগিরই এজন্য তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে

আমেরিকার মাটিতে পা রাখছেন।

কার্ল জোরলা সম্পর্কে ভালমন্দ প্রায় কিছুই জানতে পারলাম না। অস্ট্রিয়া এবং জার্মানীর স্টুডিওগুলোতে খোঁজ নিলাম টেলিফোনে। ওরা অভিনেতার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে ব্যর্থ হলো। শুধু এটুকু জানলাম 'নরকে প্রত্যাবর্তন' জোরলার প্রথম ছবি। এটি ছাড়া অন্য কোন ছবিতে সে কখনও অভিনয় করেনি। আর এই ছবিটাও বাইরে কোথাও প্রদর্শিত হয়নি। স্রেফ কাকতালীয় ভাবে ছবির একটা কপি ইঙ্গলউড এজেন্সির হাতে আসে এবং তারা সেটা এখানে পাঠায়। ইংরেজীতে 'ডাব' করা হয়নি বলে ছবিটি এবার কোথাও চালানো হয়নি।

কার্ল জোরলা সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই এখানে এসে পৌঁছুচ্ছে বলে খবর পেলাম। সে আসা মাত্র তাকে নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে আমাকে—নির্দেশ এল। সবগুলো খবরের কাগজের প্রথম পাতায় যেন ওর চেহারাখানা স্থান পায়, সে ব্যবস্থাটাই আগে করতে হবে। তিনজন প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকারকে ইতিমধ্যে কাজে লাগানো হয়েছে। গ্যাংস্টার নয়, হরর ফিল্ম হতে যাচ্ছে জোরলাকে নিয়ে। ছবির পরিচালক, আমাদের বিগ বস্ মি. ব্লেসকাইন্ডকে দেখলাম পুরো ব্যাপারটা নিয়ে বেশ উত্তেজিত।

কার্ল জোরলা ৭ অক্টোবর লস অ্যাঞ্জেলেস এসে পৌঁছুল। ওর থাকার ব্যবস্থা করা হলো হোটেলে। অভ্যর্থনা ইত্যাদি ফর্মাল ব্যাপারগুলো হয়ে যাওয়ার পর ওর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো।

স্টুডিওর ছোট্ট ড্রেসিংরুমে জোরলার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই বিকেলে দরজা খুলে ড্রেসিংরুমে ঢোকার পর ওকে দেখার দৃশ্যটির কথা জীবনেও ভুলব না আমি।

'নরকে প্রত্যাবর্তন'-এর জিন্দালাশ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। ছবির মতই লম্বা, পাতলা চেহারা। মুখটা ফ্যাকাসে, নীলচে চোখ দুটোতে মৃত্যুর শীতল ছায়া স্পষ্ট চিনতে পারলাম। সর্বগ্রাসী, ক্ষুধার্ত চাউনি।

জোরলা আমাকে দেখে পাতলা ঠোঁট ফাঁক করে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে হাসল। সামান্য ইতস্তত করে জানালাম ওকে নিয়ে পাবলিসিটি করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি। মাথা নাড়ল সে, গমগমে কণ্ঠে, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলে উঠল, 'কোন পাবলিসিটি নয়। আমি চাই না এখানে আমি কি করতে এসেছি তা কেউ জানুক।'

পাবলিসিটির কেন দরকার সেটা ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলাম। কতটুকু বুঝল জানি না, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তেই অটল রইল সে। ওর সাথে কথা বলে শুধু এটুকুই জানলাম ওর জন্ম প্রাগে, এক ধনী পরিবারে, ছবিতে নেমেছিল স্রেফ তার এক বন্ধুকে খুশি করতে। আর ওই ছবির পরিচালক, তার বন্ধু, ছবিটা করেছিল শুধুমাত্র 'প্রাইভেট শো'-র জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছবির একটা প্রিন্ট মুক্তি পেয়ে যায় এবং সেটারই কপি চলে আসে জেনারেল সার্কুলেশনে। পুরোটাই আসলে একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল, জানাল জোরলা। এরপর আমাদের ছবিতে অভিনয়ের অফার পায় সে এবং প্রস্তাবটা গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে।

'ছবিটা পাবলিককে দেখানোর পর থেকে বন্ধুদের সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়েছে,' বলল সে আস্তে আস্তে। 'ওরা চায়নি পাবলিক ওই পূজার দৃশ্যটা দেখুক।'

'কোন্‌টা—ওই প্রেতপূজার দৃশ্যটা?' জানতে চাইলাম আমি। 'আর আপনার বন্ধুরা—'

'হ্যাঁ, শয়তানের পূজারীরা আমার বন্ধু। আর ওই দৃশ্যটাও বানানো নয়, সত্যি।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বলে কি এই লোক? আমার সাথে ইয়ার্কি করছে নাকি? কিন্তু ওর চোখ দেখে মনে হলো এ লোক বানিয়ে বলছে না একটুও। কথাগুলো সত্যি, ভয়ঙ্কর রকম সত্যি। সে আসলেই শয়তানের পূজারী—সে আর তার সেই পরিচালক বন্ধু। আর তার অন্য বন্ধুরা, যারা ছবিতে শয়তানের সাধক সেজেছিল? ব্যাপারটা একান্ত গোপনীয় বলেই জোরলা কাউকে এটা জানতে দিতে চায় না। আমার মনে পড়ল বুদাপেস্ট, প্রাগ, বার্লিন ইত্যাদি জায়গায় শয়তানের পূজা চলে বলে শুনেছিলাম। আর আজ কার্ল জোরলা, ভৌতিক ছবির অভিনেতা, তাদেরই একজন বলে দাবি করছে।

'কি গল্পই না শুনলাম!' ভাবলাম আমি। এই গল্প যদি পত্রিকায় বেরোয় বিশ্বাস করবে লোকে? যে লোক ভূতের ছবিতে অভিনয় করে সে নিজেই একজন পিশাচ সাধক—উঁহুঁ, কেউ বিশ্বাস করবে না। লোকে বরিস কার্লোফের কথা জানে, 'ড্রাকুলা' ছবির কিংবদন্তী নায়ক। কিন্তু কার্লোফের মত ভদ্রলোক লাখে একটা মেলে। বেলা লুগোসিও ভয়ঙ্কর সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন, কিন্তু তাই বলে তিনি প্রেতসাধনা করতেন একথা তাঁর শত্রুও কোনদিন বলবে না।

কিন্তু জোরলা? নাহ্‌, সে স্বল্পভাষী মানুষ, তার পিশাচ সাধনার কথা কাউকে জানাতে রাজি নয়, তার গোপন জীবন নিয়ে শুরুতেই টানা হ্যাঁচড়া করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা লেসকে জানাবার তাগাদা অনুভব করলাম। সব শোনার পর ব্যাপারটা চেপে যেতে বলল সে। 'ছবিটা মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তার সম্পর্কে কিছুই বলব না। জোরলা একটি প্রতিভা। তাই এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে ওর মুড নষ্ট করে দিয়ো না। ছবিটা আগে শেষ হতে দাও।'

চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে গেছে। চার নম্বর স্টুডিওতে আমাদের ছবির শূটিং হবে। জোরলা প্রতিদিনই স্টুডিওতে আসে। লেস নিজে ওকে ইংরেজী শেখায়। জোরলা বেশ দ্রুত শিখে নিচ্ছে। কিন্তু তারপরও লেসের মুখ দেখলাম ভার। সপ্তাহে একদিন ও আসে আমার কাছে ছবি নিয়ে কথা বলতে। জোরলার প্রসঙ্গ ওঠে স্বাভাবিক ভাবেই। এবং তখুনি বেজার হয়ে যেতে দেখি ওকে। সেদিন লেস অভিযোগ করল, জোরলার আচার আচরণ বড় বেখাপ্পা ঠেকছে। সে কোথায় থাকে কেউ জানে না, কারণ ঠিকানা দিতে রাজি নয় সে। হলিউডে আসার পর যে হোটেলে ওর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, খবর নিয়ে জানা গেছে, সেখানকার পাওনা চুকিয়ে অনেক আগেই চলে গেছে সে। কিন্তু কোথায় গেছে কেউ জানে না। শুধু তাই নয়, লেসের আরও অভিযোগ, ছবি করার ব্যাপারেও জোরলার কেমন যেন গা ছাড়া ভাব। সে খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করেছে, এই ছবিতে সাইন করার পেছনে তার মূল

উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ ত্যাগ করা। জোরলা প্রেতপূজা নিয়ে আমাকে যে গল্প বলেছিল, একই কথা লেসকেও বলেছে। তবে নতুন একটা কথা শুনলাম ওর কাছে। জোরলাকে নাকি ছায়ার মত কারা অনুসরণ করে। জোরলার ভাষায় ওরা 'প্রতিশোধপরায়ণ' এবং 'খুনী'। ওর ধারণা শয়তানের পূজারীরা তার ওপর খুব রেগে আছে। 'নরকে প্রত্যাবর্তন' ছবির মুক্তির জন্যে ওকে দায়ী করছে বলে জোরলার ধারণা। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সে। আর এ কারণেই বর্তমান ঠিকানা কাউকে জানাতে রাজি নয় সে। এবং ওই একই কারণে নাকি পত্রিকায় পাবলিসিটির ব্যাপারে তার আপত্তি ছিল। স্টুডিওর ধারে কাছে ইদানীং কিছু বহিরাগতের আনাগোনাও ভাল ঠেকছে না তার কাছে। এ জন্যেই সে ভারী মেকআপ নিয়ে স্টুডিওতে আসে, যাতে চট্ করে কেউ চিনে ফেলতে না পারে।

'এই ধরনের একটা লোককে নিয়ে কি যন্ত্রণায় পড়লাম, বলো তো!' বিস্ফোরিত হলো লেস কিনকেড। 'হয় সে একটা পাগল, না হয় আস্ত বোকা। বোকা না হলে কি আর এসব প্রেতপূজাটুজা ভাওতাবাজিতে বিশ্বাস করে? চরিত্রের সাথে পুরো মিলে যাচ্ছে বলেই ওকে ছবিতে নিয়েছি। আর এজন্যে কিছু বলতেও পারছি না। লোকটা ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে গেছে, বুঝলে? আজ সকালে আমার অফিসে এসেছিল। কালো চমশা আর গলায় মাফলার জড়ানো অবস্থায় প্রথমে তো চিনতেই পারিনি। থরথর করে কাঁপছিল সে, কুঁজো হয়ে গেছে শরীর। কথা যখন বলল, আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা থেকে। সে আমাকে এই জিনিসটা দেখিয়েছে।'

লেস খবরের কাগজ থেকে কাটা একটা অংশ বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। লন্ডন টাইমস থেকে কাটা হয়েছে টুকরোটা। এক কলামের খবর—

চিত্র পরিচালক খুন

'অস্ট্রিয় চিত্র পরিচালক ফ্রিজ ওমেনকে প্যারিসের এক বাড়ির চিলেকোঠায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে। হত্যার পর দেহখানা নির্মম আক্রোশে কে বা কাহারা কোপাইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার দ্বিখণ্ডিত পেটের নাড়িভুঁড়ির ওপর একটি ক্রুশের উল্টানো ছাপ দেখা গিয়াছে। পুলিস হত্যাকারীর সন্ধান করিতেছে।'

কাগজটা নীরবে ফিরিয়ে দিলাম লেসের কাছে। যা বোঝার বুঝে গেছি আমি।

'ফ্রিজ ওমেন,' লেস আস্তে আস্তে বলল, 'জোরলা যে ছবিতে অভিনয় করেছিল তার পরিচালক ছিল। শয়তানের পূজারীদের চিনত। জোরলা বলেছে ফ্রিজ প্যারিসে পালিয়ে গিয়েছিল ভয়ে, কিন্তু ওরা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করেছে। তারপর খুন করেছে।'

আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি, কথায় বাধা দিলাম না।

বলে চলেছে কিনকেড, 'আমি জোরলাকে পুলিসী নিরাপত্তার কথা বলেছিলাম। রাজি হয়নি সে। চুক্তি অনুযায়ী আমি ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। তবে যতদিন সে আমাদের সাথে কাজ করবে, নিরাপদেই থাকবে। কিন্তু ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে, সেই সাথে নার্ভাস করে তুলেছে আমাকেও,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ও, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

লেস চলে যাওয়ার পর আমি বসে বসে কার্ল জোরলার কথাই ভাবলাম। এই লোকটা, কার্ল জোরলা, শয়তান বিশ্বাস করে, শয়তানের পূজারী। এবং তার দলের লোকদের সাথে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করে আমেরিকা পালিয়ে এসেছে। আমি যতদূর জানি এই প্রেতসাধকরা এক একটি উন্মাদ। আর তাদের গোপন কথা কেউ ফাঁস করে দিলে তাকে খুন করতেও কসুর করে না। এর প্রমাণ তো হাতেনাতেই পেলাম। এই প্রথমবারের মত উপলব্ধি করলাম জোরলাকে নিয়ে পাবলিসিটি না করে একদিক থেকে ভালই করেছি। কিন্তু পাবলিসিটি না করেও কি কোন লাভ হয়েছে? জোরলার পরিচয় কি ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে? নইলে জোরলা এত ভয় পাচ্ছে কেন? যদি তাই হয় তবে সামনে কি ঘটতে পারে আশঙ্কা করে শিউরে উঠলাম আমি।

পরবর্তী কয়েকটা দিন জোরলার সাথে আমার দেখা হলো না বললেই চলে। খুব অল্পসময়ের জন্যে দূর থেকে দেখেছি ওকে। ভীত, সন্ত্রস্ত। আর জোরলা যে 'বহিরাগতদের' কথা বলেছিল, তাদের উপস্থিতির প্রমাণও পাওয়া গেল। এদের মধ্যে একজন রেসিংকারে করে কয়েকদিন আগে স্টুডিওর গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। না পেরে পালিয়েছে। কিন্তু এক একস্ট্রা অভিনেতা একটা অটোমেটিক সহ হাতেনাতে ধরা পড়ল। লোকটা এক্সিকিউটিভ অফিসের জানালার নিচে ওঁৎ পেতে ছিল। তাকে পুলিস হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পেট থেকে কোন কথা বের করা সম্ভব হয়নি। শুনেছি লোকটা জার্মান···

এদিকে জোরলার অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। স্টুডিওতে আসে সে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে চড়ে। সশস্ত্র, দু'জন লোক থাকে সঙ্গে। জোরলা প্রায় কারও সাথেই কথা বলে না। সারাক্ষণ যেন ভয়ে কাঁপছে। ইংরেজী শেখার বারোটা বাজছে ওর দিন দিন।

কয়েকদিন পর খবর পেলাম জার্মান লোকটা মুখ খুলেছে। বিকারগ্রস্ত ওই লোক জানিয়েছে এই শহরে যেসব বিদেশী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এদের মধ্যে অনেকে একটা গুপ্ত সংগঠনের সাথে জড়িত। এরা সবাই শয়তানে বিশ্বাসী এবং প্রেতপূজারী। ওরাই তাকে ঠিক করেছিল এখানে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য। এর বেশি কিছু লোকটা বলেনি, বলতে ভয় পাচ্ছিল। তবে সে একটা ঠিকানা দিয়েছে। জায়গাটা গ্রেনডেলে। পুলিস প্রেতপূজারীদের হেডকোয়ার্টার খুঁজতে গিয়েছিল ওখানে। পুরানো, পরিত্যক্ত বাড়িটার বেসমেন্টের বিধ্বস্ত কামরায় কিছুই খুঁজে পায়নি। শুনেছি লোকটা নাকি এখন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

ওইদিন বিকেলে আমি ঠিক করলাম জোরলা কোথায় থাকে জানতে হবে, তার ঠিকানাটা খুঁজে বের করব। ওর কালো গাড়ির পিছুও নিলাম, কিন্তু তোপাঙ্গা গিরিখাতের কাছে এসে ওকে হারিয়ে ফেললাম। পাহাড়ের কোলে জোরলার গাড়িটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বহু খোঁজাখুঁজির পর হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।

ওই সন্ধ্যায় সেই যে অদৃশ্য হয়ে গেল, পরদিন সকালে তার টিকিটিও আর দেখা গেল না। অথচ শূটিং শুরু হবে মাত্র দু'দিন পর। সব ঠিকঠাক। এদিকে তারই কোন খোঁজ নেই। বিগবস্ এবং লেস কিনকেড দু'জনেই রেগে আগুন। পুলিসে খবর দেয়া হলো। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো

না। অথচ মূল্যবান একটা দিন হারিয়ে গেল। পরদিনও ওর কোন খবর পাওয়া গেল না। আমাদের প্রায় মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। আগামীকাল শূটিং অথচ জোরলার এখনও কোন পাত্তা নেই।

সারারাত আমরা দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। অফিসে বসেই কেটে গেল নির্ঘুম সময়। ভোর হলো। সকাল আটটা বাজল। কোন কথা না বলে স্টুডিও ক্যাফেটেরিয়ার দিকে এগোলাম দু'জন। এই মুহূর্তে কড়া দু'কাপ কফির খুব দরকার। দুশ্চিন্তায় মাথা ভার হয়ে আছে আমাদের। লেসের রাত জাগা লাল চোখে স্পষ্ট ভয়ের ছায়া। পুলিস এখন পর্যন্ত কোন খবর দিতে পারেনি। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। চার নম্বর স্টুডিওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখলাম জোরলার ক্রুরা কাজ করছে। হাতুড়ির ঠন্ ঠন্ শব্দটা কানে এসে বড় বাজল। যেন ব্যঙ্গ করছে। এখানে জোরলা কি আর আদৌ শূটিং করতে আসবে কোনদিন?

স্টুডিও অফিসটা পার হয়ে এসেছি, দেখি আমাদের বস্ ছবির পরিচালক মি. ব্লেসকাইন্ড ছুটে আসছেন। কিনকেডের কোট চেপে ধরে ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন খবর পেয়েছ?' লেস আস্তে মাথা নাড়ল। মি. ব্লেসকাইন্ড কোট ছেড়ে দিয়ে সিগারেট নিলেন ঠোঁটে।

'আমরা শূটিং চালিয়ে যাব,' তিক্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'জোরলাকে ছাড়া যে দৃশ্যগুলো আছে, সেগুলোর শূটিং হয়ে যাওয়ার পরেও যদি ওর সাক্ষাৎ না মেলে, তাহলে আমরা অন্য কাউকে নেব। কিন্তু কাজ থামিয়ে রাখা যাবে না।' কথাগুলো বলেই ফুটবলের মত শরীরটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, তাড়াহুড়ো করে ছুটলেন স্টুডিওর দিকে।

বস্ চলে যাওয়ার পর আমার বাহু খামচে ধরল লেস। এই প্রথম কথা বলল সে, 'চলো যাই, ওপেনিং শটগুলো দেখি। দেখি ওরা কি করছে।' চার নম্বর স্টুডিওর দিকে এগোলাম আমরা।

প্রাচীন আমলের একটা প্রাসাদ। ব্যারন উলমোর বাড়ি। পাথরের তৈরি সেলারের মাঝখানে একটা বেদি। শয়তানের বেদি। এই বেদির বড়, কালো পাথরটার ওপর ব্যারন উলমো এবং তার প্রেতপূজারীরা নিজেদের উৎসর্গিত করেছে শয়তানের উদ্দেশ্যে। কিংবদন্তী বলে, বেদির নিচে, গর্তে নাকি কবর দেয়া হয়েছে ব্যারনকে।

প্রথম দৃশ্যের শিডিউল অনুযায়ী ছবির নায়িকা সিলভিয়া চ্যানিং প্রাসাদটা আবিষ্কার করবে। এই প্রাসাদের উত্তরাধিকারিণী সে। দেখা যাবে ঘুরতে ঘুরতে সেলারে চলে এসেছে সিলভিয়া, চোখে পড়েছে বেদিটা। পাথরের গায়ে খোদাই করা লেখাগুলো পড়বে সে। আর তার পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে বেদির নিচ থেকে বেরিয়ে আসবে জোরলা, ব্যারন উলমো রূপে। সে ওখান থেকে উঠে এসে হাঁটতে শুরু করবে। কিন্তু যেহেতু আজকের দৃশ্যে জোরলা অনুপস্থিত, সেহেতু বেদির নিচ থেকে সে বেরিয়ে আসছে, এমন একটা ভান করতে হবে সিলভিয়াকে। ব্যস, আজকের মত শূটিং তাহলে এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

পুরো সেটটাই নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। আমি আর লেস পরিচালক ব্লেসকাইন্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। সিলভিয়া এগিয়ে এল সেটের দিকে; পরিচালক

তার কর্মচারীদের ইঙ্গিত দিলেন কাজ শুরু করার জন্যে। আলো জ্বলে উঠল, সাউন্ড ইকুইপমেন্ট চালু করা হলো, ওপেন হলো ক্যামেরা, ব্লেসকাইন্ড চিৎকার করে বললেন, 'অ্যাকশন!'

সিলভিয়া হেঁটে যাচ্ছে ধুলোয় ধুলোময় মেঝেয় পা ফেলে। বেদিটা চোখে পড়েছে তার, এগিয়ে এল, থামল। লেখাগুলো পড়ছে সে এবার। জোরে জোরে শব্দগুলো উচ্চারণ করল। ঠিক তখুনি গুমগুম করে একটা শব্দ ভেসে এল। পাথরের বেদি একপাশে সরে যাচ্ছে, কালো একটা গর্ত মুখ হাঁ করল। ক্যামেরা জুম হলো সিলভিয়ার মুখে। বিকট গর্তটার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে, যেন ওটার ভেতর ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেয়েছে। চমৎকার আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলেছে সিলভিয়া। ব্লেসকাইন্ড সন্তুষ্ট হয়ে 'কাট' বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছেন; ঠিক তখন---

গর্ত থেকে আবির্ভূত হলো সে।

ভয়ঙ্কর, প্রায় মুখহীন একটা মানুষ, পচা কম্বল গায়ে জড়ানো, বুকে একটা ওল্টানো রক্তাক্ত ক্রুশ, চোখ থেকে অসম্ভব ঘৃণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ লোক ব্যারন উলমো, নরক থেকে উঠে এসেছে। এবং উলমোর ভূমিকায় সে আর কেউ নয়—কার্ল জোরলা স্বয়ং।

জোরলার মেকআপ আমার কাছে দুর্দান্ত মনে হলো। মৃত্যুহিম চোখ দুটো ওর আগের ছবির কথা মনে করিয়ে দিল, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে, হালকা অন্ধকারে মুখটা ভয়ঙ্কর লাগছে। রক্তাক্ত ক্রুশটা ভীষণ জীবন্ত।

জোরলাকে ভূতের মত উপস্থিত হতে দেখে ব্লেসকাইন্ড তাঁর মুখের সিগারেটটা প্রায় গিলে ফেলেছিলেন আর কি। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন তিনি, লোকদের কাজ চালিয়ে যেতে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করলেন। বিস্ময়ে টানটান হয়ে গেছে সবার শরীর।

জোরলার এমন অভিনয় কখনও দেখিনি। আস্তে নড়ে উঠল সে, যেভাবে মরা মানুষকে ছবিতে নড়তে দেখা যায়। মনে হলো এইটুকু নড়াচড়াতেই সে দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছে। ওর ঠোঁট নড়ে উঠল, অস্পষ্ট, ভৌতিক একটা ফিসফিসানি গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেল আমাদের। জোরলার শরীর গর্ত থেকে অর্ধেক বাইরে, ফিসফিসানি বেরুচ্ছে মুখ থেকে, বুকের ওপর রক্তাক্ত ক্রুশটা যেন খুব বেশি লাল···চকিতে মনে পড়ে গেল সেই অস্ট্রিয়ান পরিচালকের কথা।

জোরলা শরীরটা টেনে তুলছে, হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল মুখ, আড়ষ্ট হয়ে গেছে দেহ, তারপরেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে ধপ করে পড়ে গেল।

কে প্রথম চিৎকার দিয়ে উঠেছিল জানি না। কিন্তু যখন আমি আর সবার সাথে গর্তের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চাইলাম কি আছে ভেতরে, গলা দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে এল আমারও। ভেতরে কেউ নেই, কিছু নেই—পুরোপুরি খালি!

ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে জোরলা। অথচ ওকে নাকি কেউ স্টুডিওর ধারে কাছেও দেখেনি, কোন মেকআপ ম্যানও তাকে মেকআপ দেয়নি; কেউ দেখেইনি সে কখন বেদির নিচের গর্তে গিয়ে ঢুকেছে। কৃত্রিম গর্তটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হলো। জোরলার চিহ্নমাত্র নেই।

রাশ দেখার জন্য ছবির প্রিন্ট ডেভেলপ করা হলো সাথে সাথে। আমাদের তিনজন টেকনিশিয়ান অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আর নায়িকা সিলভিয়ার জ্ঞান ফেরেনি এখনও। খুব চিন্তিত মুখ নিয়ে আমি, লেস আর বস্ বসলাম প্রোজেকশন বুদে। পর্দায় ফুটে উঠল ছবি।

সিলভিয়া হাঁটছে, বেদির কাছে এল, পড়ছে লেখাগুলো—পাথরের বেদিটা সরে গেল—কালো গর্ত—এবার—ওহ্, ঈশ্বর, গর্ত থেকে কিছুই বেরিয়ে এল না।

জোরলার চেহারার চিহ্নমাত্র নেই সারা পর্দায়। শুধু সেই লাল টকটকে, ওল্টানো রক্তাক্ত ক্রুশটাকে দেখলাম ভাসছে শূন্যে, তারপরই শুনতে পেলাম সেই ভৌতিক ফিসফিসানি···স্রেফ শূন্য থেকে ভেসে আসছে শব্দগুলো! সাউন্ড অ্যাডজাস্ট করলাম। স্পষ্ট শুনলাম কি বলছে জোরলা। তোপাঙ্গা গিরিখাতের কাছে একটা ঠিকানা জানাচ্ছে সে।

আলো জ্বলে উঠল। লেস এক মুহূর্ত দেরি না করে ফোন করল পুলিসকে। জোরলার দেয়া ঠিকানাটা জানাল।

অপেক্ষার পালা শুরু হলো আমাদের। নীরবে, থমথমে সময় ধীর গতিতে বয়ে চলল। ঠোঁটে মদের গ্লাস ছোঁয়াচ্ছি সবাই, কিন্তু একটি কথাও বলছি না কেউ। আমার মনে পড়ল কাগজের সেই খবরটা—অস্ট্রিয়ান পরিচালকের পেটের ওপর রক্তাক্ত ক্রুশের ছাপ দেখা গেছে, চোখের সামনে ফুটে উঠল শূন্যে ভেসে থাকা ক্রুশটা, জোরলা আর্তনাদের সুরে ফিসফিস করে কথা বলছে···

ফোন বেজে উঠল।

বিদ্যুৎ গতিতে ফোনটা তুলে নিলাম আমি। পুলিস ফোন করেছে। খবরটা জানাল ওরা। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি।

অনেকক্ষণ পর কথা যোগাল আমার মুখে। ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ, যেখানকার ঠিকানা দেয়া হয়েছিল, সেই ঠিকানাতেই পুলিস খুঁজে পেয়েছে ওকে। মৃত। খুন করা হয়েছে জোরলাকে। বুকের ওপর রক্তাক্ত একটা ক্রুশ ওল্টানো ছিল। পুলিসের ধারণা কিছু উন্মাদ লোকের কাজ এটা। জায়গাটায় ভূত প্রেত আর ডাকিনী চর্চার ওপর লেখা বেশ কিছু বই খুঁজে পেয়েছে ওরা। আর বলেছে—'

আমি একটু থামলাম। লেস চোখ দিয়ে ইশারা করল, 'বলো।'

'আর বলেছে,' ভাঙা গলায় থেমে থেমে উচ্চারণ করলাম শব্দগুলো, 'তিনদিন আগে মারা গেছে জোরলা।'

মৃত নগরী

রাত তিনটার দিকে মি. কেচামের নজরে পড়ল সাইনবোর্ডটি। জ্যাচরি: জনসংখ্যা ৬৭। তিনি নাক দিয়ে 'ঘোঁৎ' জাতীয় একটি শব্দ করলেন। মেইনের সমুদ্র তীরবর্তী এই খুদে শহরগুলোর কি কোন শেষ নেই, বিরক্ত হয়ে ভাবলেন তিনি। এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজলেন মি. কেচাম, চোখ খুলেই পুরো দাবিয়ে ধরলেন অ্যাকসেলেরেটর। ফোর্ড গাড়িটা বাঘের মত লাফ দিল সামনের দিকে।

মি. কেচাম বিশাল বপু নিয়ে হেলান দিলেন সীটের গায়ে। পা জোড়া মেলে দিলেন সামনে। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে তাঁর। ভ্রমণটা এমন বাজে হবে কল্পনাও করেননি তিনি। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলেন নিউ ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো মন ভরে দেখবেন বলে। ইচ্ছে ছিল প্রকৃতির সাথে মিশে যাবেন, রোমন্থন করবেন ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। কিন্তু কোথায় কি? বরং সফরটা অত্যন্ত নীরস এবং একঘেয়ে ঠেকছে। বিরক্তির একশেষ।

গাড়ি চালাতে চালাতে মি. কেচামের মনে হলো পুরো শহরটাই যেন ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। এঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। সব আশ্চর্য রকম নিশ্চুপ। এত বেশি নিস্তব্ধ যে ভয় ধরিয়ে দেয়।

হেড লাইটের আলোয় এক ঝলকের জন্য আরেকটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলেন মি. কেচাম। 'সর্বোচ্চ গতিসীমা ১৫ মাইল'। পরক্ষণে ওটাকে ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেলেন তিনি। বিদ্রূপাত্মক এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল মুখে, 'আচ্ছা, আচ্ছা,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, গ্যাস পেডালে চাপ বাড়ল আরও। খেয়ে দেয়ে তো আর কাজ নেই এই মরার শহরে পনেরো মাইল স্পীডে গাড়ি চালাবেন তিনি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন মি. কেচাম। অন্ধকারে দালান কোঠাগুলোকে ভূতের মত লাগছে। বিদায় জ্যাচরি, মনে মনে বললেন তিনি, বিদায় লোকসংখ্যা ৬৭।

এই সময় রিয়্যারভিউ মিররে গাড়িটির আকৃতি ফুটে উঠল। আধা ব্লক পেছনে, মাথায় একটা ঘূর্ণায়মান স্পটলাইট নিয়ে সোজা মি. কেচামের গাড়ির দিকে ছুটে আসছে সেডানটা। গাড়িটা কাদের, দেখেই বুঝতে পারলেন মি. কেচাম। নিজের অজান্তে স্পীড কমিয়ে আনলেন তিনি, টের পেলেন বুকের মধ্যে হাতুড়ির পাড় পড়ছে। স্পীড লিমিট অমান্য করেছেন ওরা দেখে ফেলেনি তো, শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন মি. কেচাম।

কালো রঙের সেডানটা চলে এল ফোর্ডের সামনে, পথ রোধ করে দাঁড়াল। সামনের জানালা দিয়ে মুখ বের করল বড় এক টুপিওয়ালা, 'গাড়ি থামান!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে।

শুকনো ঢোক গিলে মি. কেচাম ফুটপাথ ঘেঁষে তাঁর গাড়ি দাঁড় করালেন, ইমার্জেন্সী ব্রেক টেনে ধরে ইগনিশন সুইচ অফ করলেন, স্থির হয়ে গেল ফোর্ড।

পুলিসের গাড়িটা এগিয়ে এল তাঁর দিকে, থামল। ডানদিকের দরজা খুলে গেল।

ফোর্ডের হেডলাইটের আলোয় অগ্রসরমান আগন্তুকের কাঠামোটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মি. কেচাম তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে ফেললেন। আরেকবার ঢোক গিললেন তিনি। রাত তিনটার সময়, অচেনা, অজানা একটা জায়গায় পুলিস তাঁকে ধরতে আসছে স্পীড লিমিট অমান্য করার দায়ে, এরচে' মর্মান্তিক আর কি হতে পারে? মি. কেচাম চোয়াল শক্ত করে বসে রইলেন গাড়িতে।

কালো ইউনিফর্ম এবং চওড়া হ্যাট পরা লোকটা ঝুঁকল জানালার দিকে, হাত বাড়াল। 'লাইসেন্স।'

মি. কেচাম তাঁর ঈষৎ কাঁপা হাত ঢোকালেন পকেটের মধ্যে, বেরিয়ে এল কতগুলো বিলের কাগজপত্র। রাগে দাঁত কড়মড় করলেন তিনি, আবার খুঁজতে থাকলেন। এবার লাইসেন্সটা তুলে দিলেন ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে থাকা লোকটার হাতে। লোকটা ফ্লাশ লাইট ফেলল লাইসেন্সের ওপর।

'নিউজার্সি থেকে?'

'জী, জী…ওখান থেকে,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন মি. কেচাম।

পুলিসের লোকটা একভাবে চেয়ে আছে লাইসেন্সটার দিকে। মি. কেচাম অস্বস্তিতে নড়ে উঠলেন, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। 'ডেট এখনও পার হয়নি,' বললেন তিনি।

লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরক্ষণে ফ্লাশ লাইটের তীব্র আলো ঝলসে দিল মি. কেচামের চোখ। তিনি আঁতকে উঠে মাথা সরালেন। আলোটা সরে গেল। মি. কেচামের চোখে ইতিমধ্যে জল এসে গেছে। চোখ পিটপিট করলেন।

'নিউজার্সির লোকরা কি ট্রাফিক সাইন পড়তে জানে না?' পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করল।

'কি…যেন…আপনি কি ওই জ-জনসংখ্যার সাইনবোর্ডটির কথা বলছেন?'

'না, আমি অন্য একটা সাইনবোর্ডের কথা বলছি।'

'ও।' গলা খাঁকারি দিলেন মি. কেচাম। 'আমি একটাই সাইনবোর্ড দেখতে পেয়েছি।'

'তাহলে তো আপনি ড্রাইভার হিসেবে খুবই বাজে।'

'জী, মানে—'

'ওই সাইনবোর্ডে স্পষ্ট লেখা ছিল এখানকার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় পনেরো মাইল। কিন্তু আপনি পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।'

'আ-আমি দুঃখিত। আমি সত্যি ওটা দেখতে পাইনি।'

'আপনি দেখতে পান বা না পান এখানকার সর্বোচ্চ স্পীড ওই পনেরো মাইলই।'

'ইয়ে মানে—এই ভোর রাতেও?'

'সাইনবোর্ডের ওপর একটা টাইম টেবিল ছিল। দেখেননি?'

'না। দেখিনি। আমার আসলে ওই সাইনবোর্ডটিই চোখে পড়েনি।'

'তাই, না?'

মি. কেচাম অনুভব করলেন তাঁর ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সব খাড়া হয়ে

গেছে। 'এই যে ভাই; দেখুন,' ভাঙা গলায় বলতে শুরু করলেন তিনি, হঠাৎ থেমে গেলেন, পুলিসের লোকটার দিকে তাকালেন, একটু বিরতি দিয়ে আবার বললেন, 'আমি কি আমার লাইসেন্সটি ফেরত পেতে পারি?'

পুলিস অফিসার কোন কথা বলল না। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল।

'আমি কি—' মি. কেচাম আবার শুরু করলেন।

'আমাদের সঙ্গে আসুন,' কর্কশ সুরে বলল পুলিস অফিসার। ঘুরে দাঁড়াল, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল তার গাড়ির দিকে।

মি. কেচাম বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন লোকটার দিকে, জবান বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। 'এই যে ভাই, শুনুন শুনুন,' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আরে, লোকটা তাঁর লাইসেন্স নিয়েই হাঁটা শুরু করেছে। হঠাৎ পেটের মধ্যেটা ঠাণ্ডা এবং ফাঁকা ঠেকল মি. কেচামের।

'এসব হচ্ছেটা কি?' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। দেখলেন পুলিস অফিসার তার গাড়ির মধ্যে ঢুকল, ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামাল সেডান, ওটার মাথায় আবার লাল স্পট লাইট জ্বলতে শুরু করল।

মি. কেচাম সেডানের পিছু পিছু গাড়ি ছোটালেন।

'এসব খুব খারাপ হচ্ছে,' জোরে কথাটা বললেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এরকম আচরণ করার কোন অধিকার তাদের নেই। এটা কি মধ্যযুগ নাকি যে যা ইচ্ছা করল তাই চাপিয়ে দিলাম? ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কঠিন মুখে মি. কেচাম অনুসরণ করতে লাগলেন পুলিসের গাড়িটিকে।

দুই ব্লক পরে সেডান বাঁ দিকে ঘুরল। মি. কেচাম হেড লাইটের আলোয় একটা দোকান ঘর দেখতে পেলেন। মাথায় পুরানো, বিধ্বস্ত একটা সাইনবোর্ড টাঙানো 'হস্তশিল্পের দোকান'।

রাস্তায় কোন বাতি নেই। কালির মত কালো পথ ধরে এগোচ্ছেন মি. কেচাম। ঠিক সামনে পুলিসের গাড়িটির রিয়ার লাইট এবং স্পট লাইটের তিনটে লাল চোখ দানবের চোখের মত জ্বলছে। আর সবকিছু ঢেকে আছে নিঃসীম অন্ধকারে।

কি বিশ্রী একটা দিন গেল, তেতো মুখ করে ভাবছেন মি. কেচাম। সারাদিন গন্তব্যহীন যাত্রার পর শেষ পর্যন্ত সামান্য দোষে পুলিসের হাতে ধরা খেতে হলো। কেন যে তিনি নিউআর্কে ছুটিটা কাটাননি। দিব্যি ঘুমিয়ে, ভাল ভাল খাবার খেয়ে, সিনেমা, থিয়েটার দেখে কত চমৎকার সময় কাটানো যেত। এখন রীতিমত আফসোস হতে লাগল তাঁর।

পুলিসের গাড়িটি ডানদিকে ঘুরল, এক ব্লক পরে আবার বাঁয়ে মোড় নিল তারপর থেমে দাঁড়াল। মি. কেচাম ওটার ঠিক পেছনে তাঁর গাড়ি থামালেন। এ সবের কোন মানে হয় না। সস্তা নাটক হয়ে যাচ্ছে, মেইন স্ট্রীটে বসে ওরা ইচ্ছে করলেই তাঁকে জরিমানা করে ছেড়ে দিতে পারত। তা না, তাঁকে ইঁদুরের মত খেলাচ্ছে।

মি. কেচাম চুপচাপ বসে থাকলেন গাড়িতে। সামান্য এই ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে মন সায় দিচ্ছে না। ওরা চাইলে তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে জরিমানা দিয়ে চলে যেতে রাজি আছেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই তাঁর ভ্রূ

কুঁচকে উঠল। ওরা ইচ্ছে করলে যত খুশি জরিমানা করতে পারে। অঙ্কটা পাঁচশো ডলার হওয়াও বিচিত্র নয়। তিনি শুনেছেন এইসব ছোট শহরে পুলিসরাই হচ্ছে সর্বেসর্বা। তাদের কথাই আইন। সুতরাং তারা ইচ্ছে করলেই তাঁর বারোটা বাজাতে পারে। পরক্ষণে জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিলেন মি. কেচাম। ধ্যাত্তেরি, আবোলতাবোল এ সব কি ভাবছেন তিনি।

পুলিস অফিসারটি এসে দরজা খুলল। 'বেরিয়ে আসুন,' বলল সে।

এদিকের রাস্তায়ও কোন আলো নেই, বাতি জ্বলার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না আশপাশের ঘরবাড়িতে। অফিসারের কালো কাঠামোটাই শুধু নজরে পড়ছে।

ঢোক গিললেন মি. কেচাম।

'এটাই কি পুলিস স্টেশন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আলো নিভিয়ে নেমে আসুন,' বলল পুলিস অফিসার।

হেডলাইটের সুইচ অফ করে গাড়ি থেকে নামলেন মি. কেচাম। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল অফিসার, উচ্চকিত শব্দটি অনেকক্ষণ প্রতিধ্বনি তুলল, যেন রাস্তায় নয়, তারা দাঁড়িয়ে আছেন অন্ধকার একটা ওয়্যার হাউজে। মি. কেচাম আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। বিশাল এক দোয়াত কালি ঢেকে রেখেছে চাঁদ আর তারাদের।

পুলিস অফিসারের হাড্ডিসার আঙুল আচমকা চেপে বসল মি. কেচামের হাতে। এক মুহূর্তের জন্য ভারসাম্য হারালেন তিনি, অন্ধকার ফুঁড়ে যেন উদয় হলো লম্বা আরেক লোক, চট করে ধরে ফেলল সে মি. কেচামকে। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। আরেকজন পুলিস অফিসার।

'খুব অন্ধকার,' যেন অনুযোগ করছেন এমন ভাবে কথাটা বললেন মি. কেচাম। কিন্তু লোকটা কিছু বলল না। পাশাপাশি হাঁটছে সে লম্বা পা ফেলে। আরেকজন শক্ত করে ধরে আছে তাঁর হাত। ব্যথা পাচ্ছেন, মি. কেচাম। ব্যাটারা আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে, মনে মনে বললেন তিনি, কিন্তু আমি ভয় পাব না।

মি. কেচাম বুক ভরে শ্বাস টানলেন। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে সামুদ্রিক হাওয়া ঢুকল বুকে, পরক্ষণে সশব্দে বাতাসটা বের করে দিলেন তিনি। নোংরা, জঘন্য একটা শহর, লোকসংখ্যা যার সাকুল্যে ৬৭ জন, সেখানে দুজন পুলিস অফিসার রাত তিনটেয় পাহারা দিতে বেরোয়, এরচে' হাস্যকর আর কি হতে পারে?

পুলিস অফিসাররা মি. কেচামকে নিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলল। ভেতরে তাকিয়ে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মি. কেচাম। পুলিস স্টেশনই বটে। কাঠের উঁচু একটা ডেস্ক, বুলেটিন বোর্ড, পেটমোটা একটা স্টোভ, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দেয়া পুরানো একটা বেঞ্চ, মেঝেতে কার্পেট। ছেঁড়া। এক সময় হয়তো ওটার রঙ সবুজ ছিল। এখন কালচে মেরে গেছে।

'বসুন,' বলল প্রথম পুলিস অফিসার। 'আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

মি. কেচাম এই প্রথম লোকটার দিকে তাকালেন। মুখটা লম্বা, নিষ্ঠুর, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। কোটরাগত চোখ, যেন শূন্য দুটো গহ্বর হাঁ করে আছে। লোকটার পরনে ঢিলেঢালা ইউনিফর্ম।

মি. কেচাম দ্বিতীয় পুলিস অফিসারকে লক্ষ করার সময় পেলেন না, তার আগে

দু'জনেই পাশের রুমে চলে গেল। বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন মি. কেচাম। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। এই সুযোগে পালালে কেমন হয়, ভাবলেন তিনি। উঁহুঁ, ওদের কাছে তাঁর ঠিকানাসহ লাইসেন্স আছে। ধরা পড়ে যাবেন। তাছাড়া এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। ওরা হয়তো চাইছে তিনি যেন পালিয়ে যান। তাহলে গুলি করেও বসতে পারে। এদের ভাবগতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। কাজেই হঠকারী কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না।

মি. কেচাম বেঞ্চটার ওপর বসলেন। বেহুদা ঝুঁকি নেয়া বোকামি। এই ছোট শহর থেকে পালাবার আগেই ওরা তাঁকে ধরে ফেলবে। তাছাড়া ওরা তাঁকে বড়জোর জরিমানা করতে পারে—

আচ্ছা, ওরা তখন তাঁকে জরিমানা করল না কেন? এই নাটুকেপনার কি সত্যি কোন প্রয়োজন ছিল? মুখটা কঠোর হয়ে উঠল মি. কেচামের। ঠিক আছে, ওরা তাঁকে নিয়ে আর কত খেলতে পারে দেখা যাক। তিনি চোখ বুজলেন। এ দুটোকে একটু বিশ্রাম দেয়া দরকার।

কিছুক্ষণ পর আবার চোখ মেললেন মি. কেচাম।

চারপাশ অসহ্য রকম শান্ত। তিনি চারদিকে চোখ বোলাতে লাগলেন। দেয়ালগুলো যাচ্ছেতাই নোংরা, স্থানে স্থানে পলেস্তারা খসে পড়ে দাঁত দেখাচ্ছে লাল ইঁট। এক দেয়ালে একটা ঘড়ি ঝুলছে। ডেস্কের পেছনে একটা ছবি চোখে পড়ল মি. কেচামের। হাতে আঁকা ছবি। বুড়ো এক লোক। জেলেদের টুপি মাথায়। সম্ভবত জ্যাচরির বয়োজ্যেষ্ঠ নাবিকদের কেউ হবে।

কিন্তু পুলিস স্টেশনে এই লোকের ছবি থাকবে কেন, একটু অবাক হলেন মি. কেচাম। পরে নিজেই উত্তর খুঁজে বের করলেন, জ্যাচরি আটলান্টিকের তীর ঘেঁষা একটি শহর। এখানকার আয়ের মূল উৎস হতে পারে মাছ ধরা। পেশাজীবীদের বেশিরভাগই হয়তো জেলে আর নাবিক। কিন্তু তাতে আমার কি ভেবে তিনি ছবিটা থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন।

পাশের রুম থেকে দুই পুলিস অফিসারের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। কান খাড়া করলেন মি. কেচাম, শোনার চেষ্টা করলেন ওরা কি বলছে। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। বন্ধ দরজার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন। আয় ব্যাটারা, যা বলার সামনাসামনি বলবি আয়। আবার তাঁর চোখ চলে গেল দেয়াল ঘড়িটার দিকে। তিনটা বিশ। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। দেয়াল ঘড়িটা একদম ঠিক সময় দিচ্ছে। এই সময় খুলে গেল দরজা। দুই পুলিস অফিসার এসে ঢুকল ভেতরে।

একজন চলে গেল। দ্বিতীয়জন, যে মি. কেচামের লাইসেন্স নিয়েছিল, সে উঁচু ডেস্কটার দিকে এগিয়ে গেল। ডেস্কের ওপর হাঁস আকৃতির একটি বাতি, সুইচ টিপে আলো জ্বালল সে। ওপরের ড্রয়ারটা খুলল, বের করল বড় একটা লেজার বই। ঝুঁকে কি যেন লিখতে শুরু করল সে। অবশেষে ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে, ভাবলেন মি. কেচাম।

এক মিনিট এভাবেই চুপচাপ কেটে গেল।

'আ—' খুকখুক করে কাশলেন মি. কেচাম, 'আমি কি—'

লেজার বই থেকে মাথা তুলল অফিসার, ঠাণ্ডা চোখে তাকাল মি. কেচামের দিকে। তার হিমশীতল চাউনি দেখে মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন মি. কেচাম, এবার সাহস সঞ্চয় করে বলতে শুরু করলেন, 'আপনি কি···ইয়ে মানে, আমাকে কি এখন জরিমানা দিতে হবে?'

অফিসার তার চোখ ফিরিয়ে নিল লেজার বইতে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অপেক্ষা করুন।'

'কিন্তু এখন তো সাড়ে তিনটার মত—' মি. কেচাম বিস্ফোরিত হতে গিয়েও অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। 'ঠিক আছে,' নীরস গলায় বললেন তিনি, 'আপনি কি আমাকে দয়া করে বলবেন আমি কখন এখান থেকে যেতে পারব?'

পুলিস অফিসার লেখা বন্ধ করল। মি. কেচাম শক্ত হয়ে বসে থাকলেন তাঁর জায়গায়, এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন লোকটার দিকে।

পুলিস অফিসার মি. কেচামের দিকে মুখ তুলে চাইল, 'বিবাহিত?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মি. কেচাম একভাবে চেয়েই আছেন তার দিকে। যেন কথাটা কানে যায়নি তাঁর।'

'আপনি কি বিবাহিত?'

'ন্ না—লাইসেন্সে ওটা লেখাই আছে।' মি. কেচাম মনে মনে রীতিমত উল্লাস অনুভব করলেন লোকটাকে এই প্রথমবারের মত অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন বলে।

'জার্সিতে পরিবার আছে?' প্রশ্ন করল পুলিশ অফিসার।

'হ্যাঁ। মানে, না। এক বোন শুধু থাকে উইসকনস—' মি. কেচাম কথা শেষ করতে পারেননি, তার আগেই লোকটা আবার লিখতে শুরু করেছে।

'চাকরি করেন?' জানতে চাইল অফিসার।

ঢোক গিললেন মি. কেচাম। 'মানে আ-আমি নির্দিষ্ট কোন চাকরিতে—'

'তার মানে বেকার,' বলল অফিসার।

'না, না। বেকার নই,' প্রতিবাদ করে উঠলেন মি. কেচাম। 'আমি একজন ফ্রী-ল্যান্স সেলসম্যান। আমি জিনিসপত্র কিনি—' তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল পুলিস অফিসার মুখ তুলে তাকাতেই। তিনি ঢোক গিলতে চাইলেন, কিন্তু গলায় যেন একটা ডেলা পাকিয়ে গেছে, কিছুতেই নামতে চাইছে না নিচে। হঠাৎ উপলব্ধি করলেন তিনি বেঞ্চটার একেবারে কোনার ধারে বসে আছেন, প্রয়োজনে এটাকে এক ঝটকায় তুলে নিয়ে আত্মরক্ষার কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া চলবে না, নিজেকে সাজেশন দিতে শুরু করলেন মি. কেচাম। রিল্যাক্স! গভীর করে শ্বাস নিলেন তিনি, চোখ বুজলেন, স্থির ভাবে বসে থাকলেন বেঞ্চের ওপর।

ঘরে এখন দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। মি. কেচাম টের পেলেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ধীরে ধীরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত খাঁচার মধ্যে যেন দুলছে। তিনি ভারী শরীরটা বিছিয়ে দিলেন শক্ত বেঞ্চের ওপর। চোখ খুললেন। দাড়িওয়ালার সঙ্গে চোখাচোখি হলো তাঁর, বুড়ো নাবিক যেন একঠায় তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে···

'আহ্!'

মুখ দিয়ে শব্দটা বেরুল মি. কেচামের, তাঁর চোখের পাতা খুলে গেল, মণি দুটো বিস্ফারিত। ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলেন তিনি, কিন্তু আবার চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন বেঞ্চিতে।

কালো চেহারার একটা লোক ঝুঁকে আছে মি. কেচামের দিকে, হাত দুটো তাঁর কাঁধের ওপর।

'আপনি কে?' মি. কেচাম জিজ্ঞেস করলেন। তার পাঁজরে ধড়াস ধড়াস বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

'চীফ শিপলি,' জবাব দিল সে। 'আমার অফিসে একবার আসবেন?'

'অ্যাঁ?' বললেন মি. কেচাম। 'জ্বী, জ্বী, যাব।'

তিনি উঠে বসলেন। পিঠের পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে আছে। জোরে জোরে ডলতে শুরু করলেন জায়গাটা। লোকটা উঠে দাঁড়াল। অজান্তে মি. কেচামের চোখ ঘুরে গেল দেয়াল ঘড়িটির দিকে। সোয়া চারটা বাজে।

'দেখুন,' দৃঢ় গলায় বললেন মি. কেচাম, 'আমাকে জরিমানা করে আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?'

চীফ শিপলি হাসল। নিষ্প্রাণ হাসি।

'আমাদের জ্যাচরি শহরের নিয়মকানুন অন্যদের তুলনায় একটু অন্যরকম, মি. কেচাম। আসুন।' পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে, মি. কেচামকে। একটা ছোট রুমে ঢুকল দুজনে। অত্যন্ত পুরানো, বাসি একটা গন্ধ এসে নাকে ঢুকল মি. কেচামের। তার নাক কুঁচকে উঠল। কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করল না চীফ। 'বসুন,' একটা চেয়ার দেখাল সে মি. কেচামকে। নিজে গিয়ে বসল তার ডেস্কে।

উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারটায় বসলেন মি. কেচাম। ক্যাঁচকোঁচ করে তীব্র আপত্তি জানাল ওটা। কিন্তু ওর আপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তিনি বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন আমি ফাইন দিয়ে চলে যেতে পারছি না।'

'সঙ্গত কারণেই,' বলল শিপলি।

'কিন্তু,' মি. কেচাম শুরু করতে গিয়েও থেমে গেলেন। শিপলির মুখে ক্রূর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে, যেন সতর্ক করে দিচ্ছে সে মি. কেচামকে। মুখ অন্ধকার করে চেয়ারে বসে থাকলেন মি. কেচাম। চীফ গভীর মনোযোগে ডেস্কের ওপর রাখা এক তাড়া কাগজ দেখতে লাগল। লোকটার পরনের ইউনিফর্মে তাকে মোটেও মানায়নি। এরা কি জানেও না কিভাবে পোশাক পরতে হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন মি. কেচাম।

'আপনি দেখছি এখন পর্যন্ত বিয়ে শাদীই করেননি।' নীরবতা ভেঙে বলল শিপলি।

মি. কেচাম কোন কথা বললেন না। ওরা যেমন প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না, আমিও ওদের বিরুদ্ধে ঠিক একই ওষুধ প্রয়োগ করব, ঠিক করলেন তিনি।

'মেইনে আপনার বন্ধুবান্ধব আছে?' জানতে চাইল শিপলি।

'কেন?'

'জাস্ট রুটিন কোয়েশ্চেন, মি. কেচাম,' বলল চীফ, 'উইসকনসিনে আপনার বোন থাকেন, তাই না?'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন না মি. কেচাম, ট্রাফিক আইন অমান্য করার সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক?

'স্যার?' একঘেয়ে কণ্ঠে ডাকল শিপলি।

'আমি তো আপনার অফিসারকে এ ব্যাপারে আগেই বলেছি। আমি বুঝি না বারবার এক কথা বলার—'

'এখানে ব্যবসার কোন কাজে এসেছেন?'

রাগে ফেটে পড়ার হাত থেকে নিজেকে অনেক কষ্টে রক্ষা করলেন মি. কেচাম। আশ্চর্য শীতল গলায় বললেন, 'আমাকে এসব প্রশ্ন করার মানে কি?'

'রুটিন। বললেন না তো ব্যবসার কাজে এখানে এসেছেন কিনা।'

'আমি এখানে ছুটি কাটাতে এসেছিলাম। কিন্তু ছুটি আমার মাথায় উঠেছে। আমাকে এখন জরিমানা যা করার করুন। চলে যাই।'

'কিন্তু তা সম্ভব নয়, মি. কেচাম,' বলল চীফ।

মি. কেচামের মুখ হাঁ হয়ে গেল, তিনি অনেক চেষ্টার পর শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারলেন, 'মা-মানে?'

'আপনাকে বিচারপতির সামনে দাঁড়াতে হবে।'

'কিন্তু কথাটা খুব হাস্যকর শোনাচ্ছে।'

'তাই কি?'

'অবশ্যই। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক। আমি আমার নাগরিক অধিকার দাবি করছি।'

চীফ শিপলির ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল। 'আপনি আমাদের আইন ভেঙেছেন বলে সেই অধিকার এখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে,' বলল সে, 'আমরা আপনাকে যে দণ্ড দেব এখন আপনাকে তাই মাথা পেতে নিতে হবে।'

মি. কেচাম শূন্য দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালেন। বুঝতে পারছেন ওরা তাঁকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলেছে। ওরা ইচ্ছে করলে এখন যত খুশি জরিমানা করতে পারে, জেলেও ঢোকাতে পারে। তিনি এতক্ষণ বুঝতে পারেননি কেন ওরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। ওরা এখন জানে তিনি প্রায় ছিন্নমূল একজন মানুষ। তিনি বাঁচলেই কি আর—

ঘরটা হঠাৎ অসম্ভব গরম মনে হতে লাগল মি. কেচামের। ঘামে ভিজে গেল শরীর।

'আপনি তা করতে পারেন না,' চিৎকার করে উঠলেন মি. কেচাম, কিন্তু ভাঙা শোনাল কণ্ঠ।

'আজ রাতটা আপনাকে জেলে থাকতে হবে,' বলল চীফ। 'কাল সকালে বিচারপতি আসবেন।'

'কিন্তু এ অসম্ভব!' মি. কেচাম বিস্ফোরিত হলেন, 'অসম্ভব কথা বলছেন আপনি।'

পরমুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি, 'আমাকে একটা ফোন করতে হবে,' দ্রুত বললেন, 'আমাকে অবশ্যই ফোন করতেই দিতে হবে। এ আমার বৈধ অধিকার।'

'পারতেন,' বলল শিপলি, 'যদি জ্যাচরিতে কোন ফোন সার্ভিস থাকত।'

ওরা মি. কেচামকে সেলে পুরে তালা মেরে দিল। সেলের দেয়ালেও একটা পেইন্টিং ঝুলতে দেখলেন তিনি। সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো নাবিকের ছবি। মি. কেচাম এবার ইচ্ছা করেই আর দ্বিতীয়বার ফিরে তাকালেন না ছবিটার দিকে।

মি. কেচাম প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর ঘুমভাঙা ফোলা মুখে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। পেছন দিকে ঝনঝন শব্দ হতেই তিনি কনুইয়ে ভর করে সেলের দরজার দিকে তাকালেন। পুলিসী ইউনিফর্ম পরা একটি লোক দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে। একটা ট্রে নামিয়ে রাখল মাটিতে।

'সকালের নাস্তা,' বলল সে। লোকটি অন্য দুই পুলিস অফিসারের চেয়ে বয়সী, এমনকি শিপলির চেয়েও তাকে বড় মনে হচ্ছে। তার চুলের রঙ মরচে পড়া লোহার মত, দাড়ি গোঁফ কামানো পাতলা মুখ। মি. কেচাম লক্ষ করলেন এর গায়েও ইউনিফর্ম ঠিক ফিট করেনি। ঢলঢল করছে।

লোকটি দরজায় আবার তালা মারতে শুরু করেছে, এই সময় মি. কেচাম জিজ্ঞেস করলেন, 'বিচারপতির সাক্ষাৎ কখন মিলবে?'

লোকটি তাঁর দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকাল। 'জানি না,' বলে ঘুরল সে, পা বাড়াল সামনে।

'এই যে যাবেন না। শুনুন!' মি. কেচাম উচ্চস্বরে ডাকলেন তাকে, কিন্তু লোকটি তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল। জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল। সিমেন্টের মেঝেতে হিলের আওয়াজ যেন অনেকক্ষণ ধরে ভেসে বেড়াল।

মি. কেচাম উঠে বসলেন, আঙুল দিয়ে চোখ ঘষতে লাগলেন, তাকালেন ঘড়ির দিকে। সাতটা নয়। খিদে পেয়েছে খুব। হাত বাড়ালেন ট্রে-র দিকে। পরক্ষণে সরিয়ে নিলেন হাতটা।

'না,' নিজেকে চোখ রাঙালেন মি. কেচাম। ওদের দেয়া কোন খাবার তিনি খাবেন না। তিনি বুকে হাত বেঁধে, স্থির হয়ে বসে একঠায় নিজের মোজাপরা পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

খানিকপর পেটের মধ্যে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেল।

'ঠিক আছে, খুলেই দেখি না কি দিয়েছে,' খিদের কাছে শেষমেষ পরাজয় বরণ করে নিলেন মি. কেচাম। ট্রেটা টেনে নিলেন নিজের কাছে। ওপরের কাপড়টা সরিয়ে ফেললেন। একটা প্লেটে মাখন দিয়ে ভাজা তিনটে ডিম, থাক থাক মাংসের বেকন, পাশের প্লেটে পুরু করে মাখন দেয়া চার স্লাইস টোস্ট, এককাপ জেলী, তার পাশেই লম্বা গ্লাসে কমলার রস এবং একটা ডিশে ক্রীমের মধ্যে ডোবানো টসটসে স্ট্রবেরী। আর সবশেষে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটি টিপট। গরম কফির মন মাতানো গন্ধ বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে।

মি. কেচাম কমলার রসের গ্লাসটা তুলে নিলেন, ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন। স্বাদটা চমৎকার লাগল। তারপর আর ইতস্তত করলেন না তিনি। ঝাঁপিয়ে পড়লেন খাদ্য দ্রব্যগুলোর ওপর।

খেতে খেতে মি. কেচাম চিন্তা করতে লাগলেন এত চমৎকার নাস্তা পরিবেশনের

উদ্দেশ্যটা কি।

ওরা বোধহয় শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই এত আয়োজন। যাই হোক, স্বীকার করতেই হবে এদের রান্নার হাতটি বেশ ভাল। জীবনেও এত সুস্বাদু নাস্তা খাননি মি. কেচাম।

তৃতীয় কাপ কফি ধ্বংস করে ওটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছেন মি. কেচাম, এই সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। সব খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। হাসিটুকু মুখে ধরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

চীফ শিপলি এসে দাঁড়াল দরজার ওপাশে। 'নাস্তা খেয়েছেন?'

মি. কেচাম মাথা দোলালেন। কোটটা তুলে নিলেন হাতে।

কিন্তু চীফ দাঁড়িয়েই থাকল আগের জায়গায়।

'জী…?' মি. কেচাম কয়েক মুহূর্ত পর কথা বললেন। তাঁর আশা ইতিমধ্যে নিভতে শুরু করেছে।

চীফ শিপলি মি. কেচামের দিকে অর্থবোধক দৃষ্টিতে তাকাল। মি. কেচামের হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল।

'আমি কি অনুসন্ধানের জন্য…' তিনি শুরু করতে গেলেন।

'বিচারপতি এখনও আসেননি,' বলল শিপলি।

'কিন্তু…' এটুকু বলেই খেই হারিয়ে ফেললেন মি. কেচাম।

'আপনাকে শুধু খবরটা দিতে এসেছিলাম,' বলে চলে গেল চীফ শিপলি।

মাথায় রাগ উঠে গেল মি. কেচামের। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন নাস্তার প্লেটের দিকে, যেন এই অবস্থার জন্য ওটাই দায়ী। দুম করে নিজের উরুতে ঘুসি বসিয়ে দিলেন তিনি। অসহ্য! ওরা এসব কি শুরু করেছে তাঁকে নিয়ে? ভয় পাওয়াতে চাইছে? ঈশ্বর, শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন মি. কেচাম, ওরা সত্যি তাঁকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

মি. কেচাম দরজার দিকে এগোলেন। গরাদের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে তাকালেন বাইরে। পুরো প্যাসেজ খালি। কোথাও জনমনিষ্যির টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নামতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে। পা দুটোর ওজন মনে হলো কয়েক মণ। তিনি ডানহাত দিয়ে বারবার শীতল গরাদে আঘাত করতে শুরু করলেন।

বেলা দুটোর দিকে চীফ শিপলি সেই বয়সী পুলিস অফিসারকে নিয়ে মি. কেচামের সেলে ঢুকল। বিনাবাক্যব্যয়ে দরজা খুলল সে। মি. কেচামও একটিও কথা না বলে কোটটা কাঁধে ফেলে পা বাড়ালেন সেলের বাইরে। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মি. কেচামকে নিয়ে ওরা প্যাসেজ ধরে এগোল। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইলেন তিনি।

'বিচারপতি অসুস্থ,' জবাব দিল শিপলি। 'আপনার জরিমানা করার জন্য তাঁর বাড়িতে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে,' বললেন মি. কেচাম, 'আপনারা যা ভাল মনে করেন।'

'এটাই এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র করণীয় কাজ,' পাথরের মত মুখ করে

বলল শিপলি।

মি. কেচাম মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেন। যাক, শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। তিনি জরিমানা দেবেন এবং সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

বাইরে প্রচুর কুয়াশা। রাস্তায় যেন সিগারেটের ধোঁয়ার মত পাক খাচ্ছে কুয়াশা। মি. কেচাম শীতে কেঁপে উঠলেন, টুপিটা আরেকটু টেনে নামালেন কপালের নিচে। হাড্ডির মধ্যে যেন প্রবল ঠাণ্ডাটা কামড় বসাচ্ছে। বিশ্রী একটা দিন, ভাবলেন তিনি। এদিক ওদিক তাকালেন। তাঁর গাড়িটাকে খুঁজছেন।

বুড়ো পুলিস অফিসার তাদের পুলিশ কারের পেছনের দরজা মেলে ধরল। শিপলি তাঁকে ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করল।

'আমার গাড়িটার কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন মি. কেচাম।

'বিচারপতির সঙ্গে দেখা করার পর আমরা আবার এখানে আসব,' বলল শিপলি।

'কিন্তু আমার...'

মি. কেচাম ইতস্তত করতে লাগলেন। তারপর এগোলেন দরজার দিকে, বিশাল শরীর নিয়ে রীতিমত কসরৎ করে তাঁকে ঢুকতে হলো ভেতরে, ধপ্ করে বসে পড়লেন ব্যাক সীটে। বরফের মত ঠাণ্ডা চামড়া চাবুক বসাল গায়ে। তিনি ঈষৎ শিউরে উঠলেন। শিপলি ঢুকল এরপর। মি. কেচাম সরে জায়গা করে দিলেন তার জন্য।

পুলিস অফিসার দরজা বন্ধ করল সশব্দে।

আবার সেই প্রতিধ্বনি উঠল, যেন সমাধিস্থলে কোন কফিনের ঢাকনা বন্ধ করা হলো। মি. কেচাম মুখ বিকৃত করলেন।

পুলিস অফিসার ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল। খকখক কেশে উঠল এঞ্জিন। লোকটা স্টার্ট নেয়ার চেষ্টা করছে, মি. কেচাম জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে।

কুয়াশাটা এখনও ধোঁয়ার মত পাক খাচ্ছে। কাছে পিঠে কোন গ্যারেজে আগুন-টাগুন লেগেছে বোধহয়। নইলে কুয়াশার চেহারা এমন হবে কেন? মি. কেচাম গলা খাঁকারি দিলেন। তাঁর পাশে বসা চীফ শিপলি নড়ে উঠল।

'খুব ঠাণ্ডা,' বললেন মি. কেচাম।

শিপলি কোন কথা বলল না।

গাড়িটা হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে ছুটতে শুরু করল, পেছন দিকে হেলে পড়লেন মি. কেচাম। ইউ-টার্ন নিয়ে গাড়িটা কুয়াশা ঢাকা রাস্তা দিয়ে ধীর গতিতে ছুটে চলল। ভেজা পেভমেন্টে টায়ারের শব্দ হতে লাগল চটচট করে, ওয়াইপার দুটো সমান ছন্দে কাজ করে যাচ্ছে, উইন্ডশিল্ড থেকে দূর করে দিচ্ছে কুয়াশার জল।

মি. কেচাম কিছুক্ষণ পর তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় তিনটে বাজে। এই জঘন্য শহরে ইতিমধ্যে তাঁর প্রায় আধা একটা দিন কেটে গেছে। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ভৌতিক শহরটা দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছে। ঘন কুয়াশায় ফুটপাথের পাশের দালানগুলোর অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ছে। একঘেয়ে দৃশ্য। মি. কেচাম রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তাকালেন শিপলির দিকে। চীফ তার

সীটে মূর্তির মত একভাবে বসে আছে। অনড়, স্থির। দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দিকে। মি. কেচাম ঢোক গিললেন। কুয়াশাটাকে মনে হলো বুকের মধ্যে আটকে আছে।

মেইন স্ট্রীটে পড়ল ওরা। এখানে কুয়াশা অত ঘন এবং গাঢ় নয়। সমুদ্রের হাওয়ার কারণে এটা হতে পারে, ভাবলেন মি. কেচাম। তিনি রাস্তা দেখতে থাকলেন। দোকানপাট, অফিসঘর সব বন্ধ।

'লোকজন সব কই?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কি?'

'রাস্তাঘাটে তো কাউকে দেখছি না। গেল কই সব?'

'বাড়িতে,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল চীফ।

'কিন্তু আজ তো বুধবার,' বললেন মি. কেচাম, 'দোকানপাটও বন্ধ?'

'আবহাওয়া খারাপ,' বলল শিপলি, 'এই আবহাওয়ায় কে আসবে দোকানে?'

'তা অবশ্য ঠিক,' বললেন মি. কেচাম। 'আপনাদের এখানে অধিবাসীদের সংখ্যা তো সাতষট্টি, তাই না?'

চীফ কোন কথা বলল না।

'আচ্ছা, জ্যাচরির বয়স, মানে···এটা কত বছরের পুরানো শহর?'

আঙুল ফোটাল চীফ, 'দেড়শো বছর।'

'জ্যাচরির নামকরণ কি করে হলো?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না মি. কেচাম।

'নোয়া জ্যাচরি এই শহর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। স্টেশনে যার ছবি দেখলাম উনিই কি সেই···?'

'হ্যাঁ,' চুপ হয়ে গেলেন মি. কেচাম। অলস দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন একের পর এক ব্লক পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত প্রশ্নটি উদয় হলো তাঁর মনে। এত বড় একটা শহরের লোকসংখ্যা মাত্র ৬৭ জন কেন?

'আচ্ছা, এখানে মাত্র—' মুখ ফস্কে কথাগুলো বেরিয়ে যাচ্ছিল, দ্রুত লাগাম টেনে ধরলেন মি. কেচাম। তার মনের ভেতর কে যেন সতর্ক করে দিল এই প্রশ্নটা করা ঠিক হবে না। কারণ উত্তরে ভয়াবহ কিছু একটা কথা শুনতে হতে পারে।

'কি?'

'না, না, কিছু না এমনি—' সশব্দে চেপে রাখা শ্বাস ফেললেন মি. কেচাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হলো। তাঁকে ব্যাপারটা জানতেই হবে জবাব যাই আসুক না কেন।

'এখানে অধিবাসীদের সংখ্যা মাত্র সাতষট্টি জন কেন?'

'বাড়তি যারা আসে তারা চলে যায়।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মি. কেচামের। তাহলে রহস্যটা হচ্ছে এই! অবশ্য মার্কা এই মফস্বল শহরে নতুন প্রজন্মকে ধরে রাখার মত কোন ব্যবস্থাই নেই। এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়াটাই তাদের জন্য স্বাভাবিক।

মি. কেচাম সীটে হেলান দিলেন। এই পচা জায়গাটায় আমারও আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না, মনে মনে বললেন তিনি, এখান থেকে এখন বিদায় হতে

পারলেই বাঁচি।

হঠাৎ উইন্ডশিল্ড দিয়ে ব্যানারের মত একটা জিনিস দেখতে পেলেন মি. কেচাম। কাছাকাছি আসতে দেখলেন সত্যিই কাপড়ের তৈরি একটা ব্যানার। ঝুলছে রাস্তার ওপর। বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'ভোজ: আজরাতে,' সম্ভবত এই শহরের লোকজন আজ রাতে কোন উৎসবের আয়োজন করতে যাচ্ছে, ভাবলেন তিনি।

'এই জ্যাচরি ভদ্রলোক কি করতেন?' নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করলেন মি. কেচাম।

'জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন,' জবাব দিল চীফ।

'কোথায়?'

'দক্ষিণ সমুদ্রে জাহাজ চালাতেন,' বলল শিপলি।

লম্বা মেইনস্ট্রীট শেষ হলো অবশেষে। গাড়িটা ঘিঞ্জি একটা রাস্তায় ঢুকল। রাস্তার দুপাশে ঘন ঝোপঝাড় চোখে পড়ল মি. কেচামের। বিচারপতিটি কোথায় থাকেন, ভাবলেন তিনি, পাহাড়ের ওপর? নাক দিয়ে 'ঘোঁৎ' শব্দ করে নড়ে চড়ে বসলেন তিনি।

কুয়াশা ক্রমশ হালকা হতে শুরু করেছে। গাছপালা, ঘাস ইত্যাদি আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। গাড়িটা মোড় ঘুরল, ছুটল সাগরের দিকে মুখ করে। খানিকপর একটা পাহাড় লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল।

মি. কেচাম খুক খুক করে কাশলেন, 'আচ্ছা···ইয়ে মানে, বিচারপতি কি ওখানে থাকেন?'

'হ্যাঁ,' বলল চীফ।

'খুব উঁচু জায়গা,' অনিশ্চিত গলায় বললেন মি. কেচাম।

পাহাড়ের ঠিক চুড়োয় ধূসর সাদা রঙের বাড়িটি। তিনতলা। বুড়ো জ্যাচরির মতই বাড়িটি পুরানো, ভাবলেন মি. কেচাম। গাড়িটা যতই বাড়িটির দিকে এগোচ্ছে, মি. কেচামের বুক ততই শুকিয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতের দিকে তাকালেন তিনি। কাঁপছে ও দুটো। ঢোক গেলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা শুকিয়ে সাহারা মরুভূমি। খকখক কাশলেন। মনে মনে নিজেকে চোখ রাঙালেন—এসব হচ্ছেটা কি? এত ভয় পাওয়ার কি আছে। তাঁর বারবার মনে পড়তে লাগল রাস্তায় দেখা ব্যানারটার হেডিংটাকে।

দ্রুত কাছিয়ে আসছে বিচারপতির বাড়ি। মি. কেচাম অনুভব করলেন তাঁর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি ওই বাড়িতে যাব না, ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল তাঁর। দরজা খুলে লাফ মেরে পালিয়ে যাওয়ার তীব্র একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল মনে। পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

মি. কেচাম চোখ বন্ধ করলেন। নিজেকে সংযত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। আমি খামোকা ভয় পাচ্ছি, নিজেকে বোঝাতে চাইলেন তিনি। হয়তো ওই বাড়িতে পৌছার পর মারাত্মক কিছুই ঘটবে না। আমি কেন শুধু শুধু···

থেমে গেল গাড়ি। চীফ দরজা খুলে নামল। পুলিস অফিসারটি এসে পেছনের দরজাটি খুলল। মি. কেচাম লক্ষ করলেন একটা পা তিনি নড়াতে পারছেন না, যেন পঙ্গু হয়ে গেছে ওটা। দরজা ধরে অনেক কষ্টে পা রাখলেন মাটিতে।

'হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' কৈফিয়ৎ দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন মি. কেচাম।

কিন্তু অন্য দুজন কোন কথা বলল না। মি. কেচাম আড়চোখে চাইলেন বাড়িটির দিকে। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। চীফ তাঁকে আগে বাড়তে ইশারা করল। তিনজন একসঙ্গে পা বাড়াল সামনে।

'আ-আমার কাছে নগদ টাকা বিশেষ কিছু নেই,' বললেন মি. কেচাম··· ট্রাভেলার্স চেক দিলে চলবে তো?'

'চলবে,' বলল চীফ।

বারান্দা পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পুলিস অফিসারটি পিতলের তৈরি একটি বড় কি হেড ধরে মোচড় দিল। ভেতরে কোথাও একটি ঘণ্টা বেজে উঠল। মি. কেচাম দরজার পর্দার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। ডান পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে, তিনি বাঁ পায়ে সাবধানে শরীরের ওজন চাপালেন। পায়ের নিচে কাঠের মেঝে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। লোকটা আবার বেল বাজাল। 'সম্ভবত উনি খুব অসুস্থ,' মি. কেচাম ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন। এটা একটা চান্স বটে, ভাবলেন তিনি।

ওরা কেউ তাঁর দিকে তাকাল না পর্যন্ত। মি. কেচাম টের পেলেন তাঁর পেশী আবার শক্ত হয়ে উঠছে। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে তাকালেন তিনি। যদি এই মুহূর্তে কষে দৌড় মারেন ওরা কি তাঁকে ধরতে পারবে? না, এটা করা ঠিক হবে না, পালানোর বুদ্ধিটা বাতিল করে দিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। তারচে' জরিমানা দিয়ে সুবোধ বালকের মত চলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। লম্বা, রোগা এক মহিলা, পরনে কালো পোশাক, এসে দাঁড়াল সামনে। এই মহিলার গায়ের রঙও কালো, মুখে বয়সের চিহ্ন সুস্পষ্ট। মি. কেচামের হাত থেকে হঠাৎই টুপিটি খসে পড়ে গেল মাটিতে।

'ভেতরে আসুন,' বলল মহিলা।

মি. কেচাম ঘরের মধ্যে পা রাখলেন।

'আপনার টুপিটা ওখানে রাখতে পারেন,' হাত তুলে সে হ্যাট র‍্যাকটি দেখাল। মি. কেচাম কালো রঙের একটা র‍্যাকে তাঁর টুপিটি ঝুলিয়ে রাখলেন। এই সময়, সিঁড়ির গোড়ায় একটি বড় পেইন্টিং-এর দিকে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। তিনি কি যেন বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছেন, মহিলা বাধা দিল, 'এদিক দিয়ে আসুন।'

হলঘর দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। পেইন্টিংটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মি. কেচাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই মহিলাটি কে? জ্যাচরির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'ওনার স্ত্রী' উত্তর দিল চীফ।

'কিন্তু তিনি তো—'

মি. কেচামের হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আতঙ্কে কেঁপে উঠল শরীর। এও কি সম্ভব জ্যাচরির স্ত্রী এতদিন পরেও বেঁচে আছেন?

মহিলাটি একটি দরজা খুলল, 'এখানে অপেক্ষা করুন,' বলল সে।

মি. কেচাম ভেতরে ঢুকলেন। তিনি ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন চীফকে কি যেন বলতে যাবেন, এই সময় দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দ্রুত দরজার নব ঘোরাবার চেষ্টা করলেন মি. কেচাম। কিন্তু ঘুরল না ওটা।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল তাঁর। 'এই, এ সব হচ্ছেটা কি?' বন্ধ ঘরে গমগম করে উঠল তাঁর ভারী কণ্ঠ। মি. কেচাম চারদিকে তাকালেন। চারকোনা ঘর। সম্পূর্ণ খালি।

তিনি আবার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে মনে গুছিয়ে নিলেন কথাগুলো। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'আচ্ছা, এটা খুব—' জোরে মোচড় দিলেন তিনি নবে।

'ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি আপনারা আমার সঙ্গে মস্করা করছেন। কিন্তু একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে মস্করা করা কি ঠিক?'

কিন্তু কেউ তাঁর কথার জবাব দিল না। তিনি হতভম্বের মত চারপাশে তাকালেন। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। কিসের শব্দ ওটা? মনে হচ্ছে না যেন তীব্র বেগে পানির ধারা ছুটে আসছে?

'হেই,' চিৎকার করলেন মি. কেচাম, 'হেই! এসব কি শুরু করেছ তোমরা? নিজেকে কি ভাব তোমরা, অ্যাঁ?'

শব্দটা দ্রুত বেড়েই চলল। মি. কেচাম কপালের ঘাম মুছলেন হাতের চেটো দিয়ে। ঘরের আবহাওয়া যেন হঠাৎ বদলে গেছে, গরম হতে শুরু করেছে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন মি. কেচাম, 'বুঝলাম আমাকে নিয়ে মস্করা করা হচ্ছে। কিন্তু—'

হঠাৎ কেঁপে উঠলেন তিনি, সাঁৎ করে নব থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন। প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠেছে দরজাটা।

কিন্তু এ কি করে সম্ভব? আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন মি. কেচাম। উন্মাদের মত ছুটে গেলেন দরজার দিকে, দুমদুম করে ধাক্কাতে শুরু করলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'হেই! হেই! অনেক হয়েছে। এখন আমাকে দয়া করে বেরুতে দাও। নইলে আমি খুব বিপদে পড়ে যাব।'

কিন্তু কারও কোন সাড়াশব্দ নেই।

ঘরটি দ্রুত গরম হয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে যেন জ্বলন্ত উনুনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন মি. কেচাম। হঠাৎ একের পর এক দৃশ্যগুলো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। লোকগুলোর অদ্ভুত আচরণ, সবার পরনে বেমানান ঢলঢলে পোশাক, চোখে মুখে বন্য ক্রূরতা, খালি রাস্তা, জেলখানায় সেই উপাদেয় নাস্তা, তাদের চাউনি, পেইন্টিং-এর সেই মহিলা, নোয়া জ্যাচরির বউ—কি বীভৎস ভঙ্গিতে সে ছবিতে হাসছিল, তারপর রাস্তার সেই ব্যানারটা: 'ভোজ: আজরাতে,' মুখ হাঁ হয়ে গেল মি. কেচামের, গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে লাগলেন তিনি। তীব্র আতঙ্কে তাঁর চোখের মণি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র পশুদের মত, ফেনা জমে গেল ঠোঁটের কোনায়। প্রচণ্ড জোরে তিনি লাথি মারতে লাগলেন দরজায়।

'আমাকে বেরুতে দাও! আমাকে বেরুতে দাও! আমাকে বেরুতে দাও!!'

কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনল না।

ঘাসের আড়ালে কে?

বসন্তের এক চমৎকার দিনে আমি হাজির হলাম বাতেংগোয়। দক্ষিণ সাগরের পলিনেশিয়ান গ্রামগুলোর মত বাতেংগোও বিশিষ্ট হয়ে আছে তার লম্বা ঘাসের জন্যে। আর ব্রনক্স বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে আমি এবার বিশেষ শ্রেণীর ঘাস খুঁজতেই বেরিয়েছি। বাতেংগোর সবেধন নীলমণি লঞ্চঘাটে নামার পরেই পরিচয় হলো ঘাট মাস্টার গ্রেভসের সঙ্গে। সুদর্শন, হাসিখুশি স্বভাবের এই তরুণ খুব সহজেই কাউকে আপন করে নিতে পারে। এমনকি আমার পোষা কুকুর ডন, যে কিনা পলিনেশিয়ান কিংবা মেলানেশিয়ান কাউকেই পছন্দ করে না, সে পর্যন্ত গ্রেভসের ভক্ত হয়ে গেল দশ মিনিটের মধ্যে।

গ্রেভসের ঢেউ খেলানো লোহার ছাদের বাড়িটি আপাদমস্তক ঘোষণা করছে এখানে একজন অবিবাহিত পুরুষ মানুষ বাস করে। গ্রেভস এই দ্বীপে আছে বছর তিনেক। গর্বিত সুরে জানাল, এই সময়ের মধ্যে একদিনও তাকে কেউ কর্তব্যকর্মে গাফিলতি করতে দেখেনি। বেশ কিছুদিন ধরে সাদা চামড়ার মানুষের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত গ্রেভস। আমাকে দেখে এত খুশি হলো যে পরিচয়ের আধঘন্টার মধ্যে জেনে ফেললাম তার শৈশবের সমস্ত ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

অবশ্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটি খুবই সরল। পরবর্তী ট্রিপে যে স্টীমারটি আসছে ওটায় চড়ে তার বান্ধবী আসবে আমেরিকা থেকে। তারা দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং স্টীমারের ক্যাপ্টেন ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

'বন্ধু,' বলল সে, 'আপনি হয়তো ভাবছেন আমার প্রেমিকা এখানে এসে খুবই একা অনুভব করবে। কিন্তু আপনি জানেন না আমি আমার সমস্ত ভালবাসার অর্ঘ্য তার পায়ের তলায় নিবেদন করব। নিঃসঙ্গতা তাকে ছুঁতেই পারবে না। একজন মানুষ, যে সারাদিন ভাবতে থাকে কি করে তার প্রেমিকাকে সুখী করবে, সে তার স্বপ্নকন্যাকে কাছে পেলে কি করবে কল্পনা করুন তো একবার! আচ্ছা আপনি না হয় এবার ভেতরে আসুন। ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই।'

গ্রেভস আমাকে নিয়ে তার বেডরূমে ঢুকল, ড্রেসিং টেবিলের ওপর দেয়ালে বাঁধানো একটি বড় ছবির সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

একজন সামান্য ঘাট মাস্টারের প্রেমিকা এত সুন্দরী হবে আমি কল্পনাই করিনি। মেয়েটি শুধু রূপবতীই নয়, অদ্ভুত লাবণ্যময়ী। অদ্ভুত নিষ্পাপ একটি ভাব খেলা করছে তার সুন্দর মুখখানায়।

'খুব সুন্দরী,' বলল সে। 'তাই না?'

এতক্ষণ চুপচাপ গ্রেভসের কথাই শুনে গেছি। এবার মন্তব্য করলাম, 'আমি এখন দিব্যি বুঝতে পারছি কেন আপনি এই অসাধারণ রূপবতী মেয়েটির ছবির দিকে তাকিয়ে নিজেকে একা ভাবেন না। এই মেয়ে কি সত্যি সামনের ট্রিপে এখানে আসছে? আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'হ্যাঁ,' বলল গ্রেভস। 'সুন্দর না?'

'একজন ঘাট মাস্টার,' বলে চললাম আমি, 'তার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য এমনকি তার পোষা কুকুর, বেড়ালের সঙ্গেও কথা বলে। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি আসল মানুষটিকে না দেখেও তার ছবির সঙ্গে কথা বলে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়া যায় যদি সে হয় এরকম শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যের অধিকারিণী। আসুন, হাত মেলাই।'

তারপর আমি গ্রেভসকে প্রায় একরকম টেনেই ও ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম। কারণ আমার হাতে সময় খুব কম। যে কাজে এসেছি ওটার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি খোঁজ খবর নেয়া দরকার।

'আমি কি কাজে এসেছি তা কিন্তু এখনও আপনি জানতে চাননি,' বললাম আমি। 'তাই নিজে থেকেই বলছি। আমি ব্রনক্স বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে ঘাস সংগ্রহ করছি।'

'আচ্ছা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল গ্রেভস। 'তাহলে আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন, ভাই। এই দ্বীপে একটা গাছও আপনার চোখে পড়বে কিনা সন্দেহ। কিন্তু চারদিকে আপনি শুধু ঘাসের বন্যাই দেখতে পাবেন। আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই কমপক্ষে পঞ্চাশ রকমের ঘাস রয়েছে।'

'আঠারো পদের ঘাস অবশ্য ইতিমধ্যে আমার চোখে পড়েছে,' বললাম আমি। 'কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে বাতেংগো দ্বীপের ঘাসে কখন আঁটি হয়?'

'আপনি ভেবেছেন এই প্রশ্ন করে আমাকে বোকা বানাবেন, তাই না?' বলল সে। 'কিন্তু ঘাট মাস্টারের কাজ করলেও এসবেরও ছিটেফোঁটা খবর আমি রাখি, ভাই সাহেব। ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল সে, 'ওগুলোকে আমরা বিচ নাট বলি—ওগুলোতে প্রথম আঁটি জন্মাবে। আর যতদূর জানি সপ্তাহ ছয়েকের মধ্যেই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যাবে।'

'সত্যি বলছেন?'

'আরে, আমি মিথ্যা বলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'সেক্ষেত্রে,' বললাম আমি, 'আপনি আমাকে নির্ধারিত সময়েই আবার এখানে দেখতে পাবেন।'

'সত্যি?' উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গ্রেভসের মুখ। 'তাহলে তো আপনি আমাদের বিয়েতেও অংশ নিতে পারবেন।'

'ও ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আমি আপনার স্বপ্নকন্যাকে বাস্তবে দেখতে চাই।'

'আপনি যাওয়ার পর আপনার কাজে লাগে এমন কিছু সাহায্য কি করতে পারি? আমার হাতে এমনিতেই প্রচুর সময়···'

'ঘাস সম্বন্ধে যদি আপনার মোটামুটি একটা ধারণা থাকে···'

'তা অবশ্য নেই। তবে আমি ওদিকটাতে একবার যাব। যদিও যেতে হবে একাই। কারণ ওরা কেউ আমার সঙ্গে যেতে চাইবে না।'

'গ্রামের লোক?'

'হ্যাঁ। কুসংস্কারে বোঝাই সব। মানুষের চেয়ে ওই গ্রামে কাঠের দেবতার সংখ্যা বেশি। আর সবাই যেন আত্মহত্যার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সবকটা পাগল···আলোইট!' হাঁক ছাড়ল গ্রেভস।

তার ডাক শুনে বাড়ির ভেতর থেকে হেলেদুলে বেরিয়ে এল দশ বারো বছরের একটি ছেলে।

'আলোইট,' বলল গ্রেভস, 'এক দৌড়ে দ্বীপের পাহাড়টায় উঠে এই ভদ্রলোকের জন্য কিছু ঘাস নিয়ে আসতে পারবে? উনি তোমাকে এই জন্যে পাঁচ ডলার বকশিশ দেবেন।'

মুখ শুকিয়ে গেল আলোইটের। মাথা নাড়ল। যাবে না সে।

'পঞ্চাশ ডলার?'

এবার আরও জোরে মাথা নাড়ল আলোইট। আমি শিস দিয়ে উঠলাম। এতগুলো টাকার লোভ কেউ সামলাতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।

'তাহলে ফোট্ ব্যাটা কাপুরুষ,' ধমকে উঠল গ্রেভস। আমার দিকে ফিরে বলল, 'দেখলেন তো? টাকা পয়সা, মারধোর কোন কিছু দিয়েই ওদেরকে সাগর তীর থেকে এক মাইল দূরেও নিয়ে যেতে পারবেন না। ওরা বলে পাহাড়ের কাছে ওই ঘাসের রাজ্যে গেলে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আপনার জীবনেও ঘটতে পারে।'

'কোন্ ঘটনা?'

'বহু বছর আগে এক মহিলা গিয়েছিল ওখানে,' বলল গ্রেভস। 'মহিলাকে পরে লম্বা ঘাসের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার শরীর পুরোটা কালো হয়ে ফুলে গিয়েছিল। পায়ের গোছের ঠিক ওপরে কিসে যেন কামড় দিয়েছিল তাকে।'

'সাপ হতেই পারে না,' বললাম আমি। 'আমি খুব ভাল করেই জানি এসব দ্বীপে সাপ নেই।'

'সাপে কামড়েছে এমন কথা ওরাও বলেনি,' বলল গ্রেভস। 'ওরা বলেছে কামড়ের জায়গায় খুব ছোট ছোট দাঁতের দাগ দেখা গেছে। যেন খুব ছোট বাচ্চা কামড়েছে।' উঠে দাঁড়াল সে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'এসব গাঁজাখুরি ব্যাপার নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। আপনি ঘাস খুঁজতে ওদিকে যেতে চান তো একাই যেতে হবে। আর যদি না যান তাহলে চলুন একবার ঘাটের দিকে যাই। একটা ব্রেক ভেঙে গেছে। ওটাকে মেরামত করতে হবে।'

হপ্তা পাঁচেক পর আমি আবার যাত্রা শুরু করলাম বাতেংগো দ্বীপের দিকে। একমাসেরও বেশি সময় ধরে আমি মানুষ জনের সঙ্গ থেকে এক রকম বঞ্চিত। তাই যতই বাতেংগোর লঞ্চ ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের জলযান, ততই উৎফুল্ল হয়ে উঠছি আমি। গ্রেভস এবং তার ভাবি স্ত্রীর কথা ভাবছি। মেয়েটির সৎসাহসের প্রশংসা করতেই হয়। সব কিছু ছেড়ে দক্ষিণ সাগরের এই নির্জন দ্বীপে শুধু তার প্রেমিকের স্বার্থে বসবাস করতে আসা চাট্টিখানি কথা নয়।

অবশেষে তীরে এসে ভিড়ল তরী। হাঁটুর কাছে রাখা শটগানটি তুলে নিলাম

হাতে। ডন ঘেউ ঘেউ করে তার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম।

গুলির শব্দে বেরিয়ে এল গ্রেভস তার বাড়ি থেকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি রুমাল নাড়তে লাগল। আমি মেগাফোনে চিৎকার করে বললাম তাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। জানতে চাইলাম সে বাতেংগোতে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে কিনা।

এতদূর থেকেও গ্রেভসের ব্যবহারে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষ করলাম আমি। কয়েক মিনিট পর মাথায় একটি টুপি চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরুল সে। দরজা বন্ধ করল। হাঁটতে শুরু করল গ্রামের দিকে। কিন্তু ওর হাঁটার ভঙ্গিতেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি অনুপস্থিত। আমাকে দেখে সে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না।

'আশ্চর্য তো!' ডনকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি। 'গ্রেভসের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে।'

ডনকে নিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম আমি। এগোলাম তীর ধরে। অনেক গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছে তীরে। এত অচেনা মানুষের উপস্থিতি ডনের জন্যে রীতিমত অস্বস্তিকর। সে আমার পায়ে পায়ে চলতে লাগল। গ্রেভস আসার আগেই তীরে পৌছে গেলাম আমরা। গ্রেভস ওখানে হাজির হতেই গ্রামবাসীরা সভয়ে সরে গেল দূরে, যেন কোন কুষ্ঠরোগীকে দেখছে। আমার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসল গ্রেভস, কথা বলার জন্যে মুখ খুলতেই ডন পা শক্ত করে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল।

'ডন!' চাপা গলায় ধমকে উঠলাম আমি। ডন গুটিসুটি মেরে গেল, কিন্তু ওর পিঠের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকল গ্রেভসের দিকে। গ্রেভসের মুখটা টানটান, রাগরাগ একটা ভাব। ছেলেমানুষি ভাবটা চেহারা থেকে একেবারেই উধাও। কিছু একটা ব্যাপারে ও খুব টেনশনে আছে, মনে হলো আমার।

'এই যে বন্ধু,' বললাম আমি। 'খবর কি তোমার?'

গ্রেভস ডানে আর বাঁয়ে তাকাল একবার, লোকগুলো সিঁটিয়ে গেল, পিছু হটল আরও কয়েক পা।

'খবর তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ,' কাঠখোট্টা গলায় জবাব দিল সে। 'আমাকে একঘরে করা হয়েছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'এমনকি তোমার কুকুরটাও তা বুঝতে পেরেছে। ডন, গুড বয়! এদিকে এসো!'

ডন গরগর করে উঠল।

'দেখলে তো!'

'ডন!' ধারাল গলায় বললাম আমি। 'এই লোকটি আমার বন্ধু। তোমারও। যাও, গ্রেভস। ওকে একটু আদর করো!'

গ্রেভস এগোল ডনের দিকে। ওর মাথায় চাপড় মেরে আদুরে গলায় কি যেন বলতে লাগল।

ডন এবার আর গর্জন করল না বটে, কিন্তু গ্রেভসের প্রতিটি চাপড়ে শিউরে

উঠল সে, যেন খুব ভয় পাচ্ছে।

'তাহলে তোমাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে, অ্যাঁ?' ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ কৌতুককর মনে হলো। 'তা তোমার দোষটা কি?'

'কিছুই না। আমি শুধু ওই ঘাসের জঙ্গলে গিয়েছিলাম,' বলল গ্রেভস। 'আর আমার···আমার কিছু হয়নি বলে ওরা আমাকে একঘরে করেছে।'

'মাত্র এই?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা!' বললাম আমি। 'আমিও শিগ্‌গির একবার ওদিকে যাব। তার মানে আমাকেও ওরা একঘরে করে রাখবে। তাহলে ভালই হবে। একসঙ্গে দু'জন একঘরে হব। আচ্ছা, আমার জন্যে ইন্টারেস্টিং কোন ঘাসের সন্ধান পেয়েছ ওখানে?'

'ঘাসের খবর আমি জানি না,' বলল সে। 'কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছি। ওটা তোমাকে দেখাব এবং তোমার কাছে কিছু পরামর্শও নেব। যাবে নাকি আমার বাড়িতে?'

'লঞ্চেই রাত কাটাব ঠিক করেছি,' বললাম আমি। 'কিন্তু তুমি যদি জোরাজুরি করো আর রাতের খাবারটা—'

'আমি তোমার জন্যে এখনই লাঞ্চের ব্যবস্থা করছি,' তাড়াতাড়ি বলল গ্রেভস। একঘরে হয়ে থাকার পর থেকে রান্নাবান্না সব নিজেকেই করতে হচ্ছে। অবশ্য আমার রান্না তোমার খুব একটা খারাপ লাগবে না আশা করি।'

গ্রেভসকে এখন অনেকটা হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

'ডনকে সঙ্গে নেব?'

একটু ইতস্তত করল গ্রেভস, 'আ···ইয়ে···ঠিক আছে।'

'তোমার অসুবিধে হলে থাক।'

'ঠিক আছে, ওকে নিয়ে চলো। দেখি ওর সঙ্গে আবার নতুন করে ভাব করা যায় কিনা।'

হাঁটতে শুরু করলাম আমরা গ্রেভসের সঙ্গে। ডন আমার পায়ের সঙ্গে সেঁটেই থাকল।

'গ্রেভস,' বললাম আমি। 'এইসব অশিক্ষিত গ্রামবাসী তোমাকে একঘরে করে রেখেছে এটা তোমার মন খারাপের কারণ নয়। অন্য কিছু একটা হয়েছে। কি সেটা? কোন খারাপ খবর?'

'আরে না,' বলল সে। 'ও ঠিকই আসছে। এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তোমাকে আস্তে আস্তে সব খুলে বলব। আমার ওপর রাগ কোরো না। আমি ঠিকই আছি।'

'কিন্তু তখন যে বললে ঘাসের জঙ্গলে কি ইন্টারেস্টিং একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছ?'

'পাথরের বিশাল একটি স্তম্ভ দেখেছি। জিনিসটা নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিঙের মতই বড়। হাজার বছর আগের পুরানো, খোদাই করা। মেয়ে মানুষের মূর্তির মত। এছাড়াও অদ্ভুত ধরনের কিছু ঘাস চোখে পড়েছে—তোমার কৌতূহল

জাগবে। আমি তো আর তোমার মত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নই, তাই ওগুলোকে আলাদা ভাবে চিনতে পারিনি। ঘাসগুলোর নিচে লক্ষ লক্ষ ফুলও চোখে পড়ল…মানে কি বলব, এই জায়গাটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ জায়গা বলে মনে হয়েছে আমার।'

দরজা খুলল গ্রেভস, এক পাশে সরে দাঁড়াল আমাকে আগে যেতে দেয়ার জন্যে। আমি ভেতরে পা বাড়াতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল ডন।

'শাট আপ, ডন!'

ঠাস করে একটা থাবড়া বসালাম ওর নাকে। চুপ হয়ে গেল ডন, আমার সঙ্গে ভেতরে ঢুকল ভদ্র ছেলের মত। কিন্তু শরীর আড়ষ্ট হয়েই থাকল ওর।

গ্রেভসের বুকশেলফের ওপর জিনিসটাকে চোখে পড়ল আমার। হালকা বাদামী রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি ওটা, রক্তচন্দন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, গোলাপী একটি আভাও রয়েছে। ফুট খানেক উঁচু, কাঠ দিয়ে খোদাই করা জিনিসটা একটি পনেরো ষোলো বছরের মেয়ের মূর্তি। খোদাইয়ের কাজ এত নিখুঁত যে মূর্তিটাকে দারুণ জীবন্ত লাগল আমার কাছে। এমন জিনিস পলিনেশিয়ান বা অন্য কোন দ্বীপে এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার।

মূর্তিটি নগ্ন। ওর চোখ দুটি ইস্পাত নীল। ভ্রূ আর চোখের পাতা ঠিক যেন রেশম, একদম রক্তমাংসের নারীর মত। মূর্তিটি এত বেশি জীবন্ত যে কেমন ভয়ভয় করতে লাগল। ডনও চঞ্চল হয়ে উঠে চাপা গলায় গোঁ গোঁ শুরু করল। আমি তাড়াতাড়ি ওর ঘাড় চেপে ধরলাম। মূর্তিটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে ওর একশো ভাগ।

মূর্তিটির দিকে চোখ তুলে তাকাতেই ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। ওটা কৌতূহল আর অবজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে আছে ডনের দিকে। তারপর ওটার ছোট, বাদামী বুক দুটো ফুলে উঠল, আবার সমান হলো, সবশেষে নাক দিয়ে সশব্দে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আঁতকে উঠে একলাফে পিছিয়ে এলাম আমি, পড়লাম গিয়ে গ্রেভসের গায়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'মাই গড! ওটা জীবন্ত!'

'সুন্দর না!' বলল গ্রেভস, "ওকে আমি ঘাসের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছি। ভয়ানক দুষ্টু আর চঞ্চল ও। তোমার বন্দুকের আওয়াজ শোনার পর ওকে ওখানে তুলে রেখেছি। যাতে দুষ্টুমি করতে না পারে। অত উঁচু থেকে ও লাফাতে পারবে না।'

'ওকে তুমি ঘাসের জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছ!' রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম আমি। 'ওখানে আরও এরকম আছে নাকি?'

'থকথক করছে কোয়েল পাখিদের মত।' বলল সে। 'কিন্তু ওদের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।' জিনিসটার দিকে তাকাল গ্রেভস, মুচকি হাসল। 'কিন্তু তুমি কৌতূহল চাপতে না পেরে বেরিয়ে এসেছিলে, তাই না, খুকি? তারপর তোমার ঘাড়টা ক্যাক করে চেপে ধরে এখানে নিয়ে এলাম আমি। তুমি আমাকে কামড়াবার সুযোগই পাওনি!'

ওটার ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো। সাদা, ঝকঝকে একসারি দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। গ্রেভসের দিকে তাকাল সে. কঠিন চোখ দুটিতে ফুটে উঠল নমনীয়তা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম গ্রেভসকে সে খুবই পছন্দ করে।

'ও এক অদ্ভুত পোষা প্রাণী, তাই না?' বলল গ্রেভস।

'অদ্ভুত?' বললাম আমি। 'বরং বলো ভয়ঙ্কর। ওটাকে—ওটাকেও একঘরে করে রাখা উচিত। ডন ওটাকে মোটেই পছন্দ করেনি। জিনিসটাকে খুন করতে যাচ্ছিল সে।'

'ওকে দয়া করে জিনিস বলো না,' অনুরোধ করল গ্রেভস। 'আর অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও কোরো না। তোমার কথা বুঝতে পারলে খুবই মাইণ্ড করবে।' তারপর সে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল ওটার সঙ্গে। ভাষাটা গ্রীক বলে মনে হলো। জিনিসটা কথা বলার সময় বারবার উঁচু গলায় হেসে উঠল। হাসিটা মিষ্টি, যেন ঘণ্টা বাজল টুং টাং করে।

'তুমি ওর ভাষা জানো?'

'অল্প অল্প—টং মা লাও?'

'না!'

'আনা টন সাগ আটো।'

'নান টেন ডম উড লন আড়ি!'

ফিসফিস করে, খুব নরম গলায় কথা বলছে ওরা। আমার দিকে ফিরল গ্রেভস। 'ও বলছে কুকুরটাকে সে ভয় পায় না। আর সে একা থাকতেই বেশি পছন্দ করবে। তোমার কুকুরটা যেন তাকে বিরক্ত না করে।'

'ডনের তেমন কোন ইচ্ছেও নেই,' বললাম আমি। 'এখন দয়া করে বাইরে চলো। ওকে আমার মোটেও ভাল লাগছে না। ভয় পাচ্ছি আমি।'

জিনিসটাকে শেলফ থেকে নিচে নামাল গ্রেভস, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

'গ্রেভস,' বললাম আমি, 'তোমার ওই এক মুঠি জিনিসটা কোন শুয়োর কিংবা বানর নয়, একটি মেয়ে। তুমি ওকে তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে অপহরণের মত মারাত্মক অপরাধ করেছ। এখন আমার পরামর্শ হচ্ছে যেখান থেকে এনেছ সেখানে ওকে রেখে এসো। তাছাড়া মিস চেস্টার ওকে দেখলেই বা কি ভাববেন?'

'ওকে নিয়ে আমি চিন্তিত নই,' বলল গ্রেভস। 'কিন্তু আমি অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তায় আছি—খুবই চিন্তায় আছি। কথাটা কি এখন বলব নাকি লাঞ্চের পর?'

'না, এখন বলো,' বললাম আমি।

'তাহলে শোনো,' শুরু করল গ্রেভস। 'তুমি চলে যাওয়ার পর আমিও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠি। তোমার জন্যে ঘাসের নমুনা সংগ্রহ করতে দু'বার ওদিকে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার আমি একটি গভীর উপত্যকার মত জায়গায় ঢুকে পড়ি। ওখানকার ঘাসগুলো বুক সমান উঁচু। আর ওখানেই বিশাল এক পাথরের স্তম্ভকে পড়ে থাকতে দেখি। একই সঙ্গে আমার চোখে পড়ে কিছু জীবন্ত প্রাণী। ওরা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি ওদের পিছু ধাওয়া করি। ওখানে

প্রচুর আলগা পাথর ছড়ানো ছিটানো ছিল। একটা পাথর হাতে তুলে নিই ওগুলোর কোনটাকে কব্জা করা যায় কিনা ভেবে। হঠাৎ দেখি কতগুলো ঘাসের আড়াল থেকে এক জোড়া ছোট, উজ্জ্বল চোখ উঁকি দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা ছুঁড়ে মারি জিনিসটাকে লক্ষ্য করে। ধপাস করে পাথরটা ঘাসের মধ্যে পড়তেই গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই আমি। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যাই ওদিকে। তারপর ওকে দেখতে পাই আমি।

আমাকে দেখে তেড়ে কামড়াতে এসেছিল ও। আমি চট করে ওর ঘাড়টা দু'আঙুল দিয়ে চেপে ধরতেই নিস্তেজ হয়ে যায়। তাছাড়া, পাথরের আঘাতে বেশ আহত হয়েছিল ও। আমার হাতে মরার মত পড়েছিল। ওকে ওভাবে মরতে দিতে মন চায়নি আমার। তাই ওকে বাড়িতে নিয়ে আসি। হপ্তাখানেক খুবই অসুস্থ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গে খেলতে থাকে। আমার টেবিলের নিচের দেরাজটা খুলে প্রায়ই ওটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে ও। আর আমার রানারের বুট জুতো জোড়াকে বানিয়েছে খেলনা বাড়ি। সঙ্গী হিসেবে ও পোষা বেড়াল, কুকুর কিংবা বানরের মতই ভাল। তাছাড়া ও এত ছোট যে ওকে আমি আমার পোষা একটি প্রাণী ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারি না। তো এই হচ্ছে ওর গল্প। এরকম ঘটনা যে কারও জীবনে ঘটতে পারে, পারে না?'

'হুম, তা পারে,' বললাম আমি। 'কিন্তু প্রথম দর্শনেই যে মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয় তাকে পোষার কোন মানে আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার কথা যদি শোনো তাহলে বলব, ওকে যেখানে পেয়েছ সেখানে রেখে এসো।'

'চেষ্টা করেছিলাম,' বলল গ্রেভস। 'কিন্তু ওকে ছেড়ে আসার পরদিন সকালেই দেখি আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে—চোখ দিয়ে জল পড়ছে না, কিন্তু কাঁদছে···তুমি অবশ্য একটা কথা ঠিকই বলেছ—ও শুয়োর কিংবা বানর নয়—একটি মেয়ে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ ওটা তোমার প্রেমে পড়েছে?' ঠাট্টার সুরে বললাম আমি।

'সম্ভবত তাই।'

'গ্রেভস,' এবার সিরিয়াস হলাম আমি। 'মিস চেস্টার সামনের ট্রিপের স্টীমারেই আসছেন। এর মধ্যে যা করার করতে হবে।'

'কি করব?' অসহায় গলায় বলল গ্রেভস।

'এখনও জানি না। তবে আমাকে ভাবতে দাও,' বললাম আমি।

মিস চেস্টার আর সপ্তাহখানেক পরে আসবে। ইতিমধ্যে গ্রেভস বার দুই চেষ্টা করেছে বো-কে (ওটার নাম 'বো' রেখেছে সে) ঘাসের জঙ্গলে ছেড়ে আসতে। কিন্তু দুইবারই তাকে পরদিন ভোরবেলা দেখা গেছে বারান্দায় বসে কাঁদতে। আমরা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি বো-র আত্মীয় স্বজনকে খুঁজে বের করতে। গ্রেভস ওকে তার জ্যাকেটের পকেটে পুরে বেরিয়েছে। কিন্তু কোনবারই সফল হইনি। বো ইচ্ছে করলেই পথ দেখাতে পারত। কিন্তু ইচ্ছে করেনি। খোঁজাখুঁজি পর্বের পুরো সময়টা আমরা তাকে দেখেছি গোমড়া মুখ করে থাকতে। গ্রেভস যে

ক'বার তাকে মাটিতে নামিয়ে রাখতে চেয়েছে, ততবার সে গ্রেভসের জামার হাতা ধরে ঝুলে থেকেছে। হাত থেকে তাকে ছুটাতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে ওকে।

খোলা জায়গায় বো-র গতি ইঁদুরের মতই দ্রুত। আর তাকে ছুঁড়ে ফেলেও নিস্তার নেই, এক দৌড়ে ছুটে এসে ধরত সে আমাদের। কিন্তু ঘন ঘাসের মধ্যে ভালভাবে চলতে পারত না। আমরা ওকে ফেলে দ্রুত চলে যাচ্ছি, এই সময় কাঁদতে শুরু করত বো। এই কান্না সহ্য করা সত্যি কঠিন।

আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না বো। কিন্তু আমার ওপর চড়াও হওয়ার সাহসও পায় না। কারণ সে দেখেছে গ্রেভসের ওপর আমার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আর আমিও বো-কে কখনও ঘাঁটাতে যাই না। মানুষ সাপ কিংবা বড় ইঁদুরকে যেমন ভয় পায়, বো-কে আমিও তেমনি ভয় পাই। এমনিতে বো-কে দেখলে যে কোন লোকেরই ভাল লাগবে। কিন্তু ও যখন লাফ মেরে মাছি কিংবা ঘাস ফড়িং ধরে কচকচিয়ে জ্যান্ত চিবিয়ে খায়, কিংবা ওর সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করতে গেলেই ওর কান দুটো বেড়ালের মত মিশে যায় মাথার পেছনে এবং হিস হিস শব্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ে, তখন দেখে খুবই ভয় লাগে, ভালবাসতে ইচ্ছে করে না।

ডনও বো-র সঙ্গে লাগতে যায় না। ইতিমধ্যে সে বুঝে গেছে তার প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী। বো তার দিকে কোন কারণে তেড়ে আসলে সে রুখে দাঁড়ায় না, বরং লেজ উল্টে পালায়। আমার মত ডনও বুঝতে পেরেছে বো-র মধ্যে সাংঘাতিক কিছু একটা আছে যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সুতরাং ওকে না ঘাঁটানোই ভাল।

একদিন ভোরবেলা, আমরা দিগন্ত রেখায় ধোঁয়া দেখতে পেলাম। গ্রেভস তাড়াতাড়ি তার রিভলভার বের করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর স্টীমার আসছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বললাম আমি। 'তাই মনে হচ্ছে। তবে এখনই আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'বো-র ব্যাপারে?'

'অবশ্যই। বো-কে দিন কয়েকের জন্য আমার কাছে রাখব। তোমরা দু'জনে মিলে ঘরসংসার একটু সাজাও। তারপর মিসেস চেস্টার, মানে মিসেস গ্রেভার ঠিক করবেন কি করা যায়। তবে বো-কে এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আভাস দিয়ো না। ওকে আমার লঞ্চে নিয়ে এসো। তারপরের সব দায়িত্ব আমার।'

খুশি মনে আমার পরামর্শ মেনে নিল গ্রেভস। বো-কে নিয়ে সে আমার লঞ্চে চলে এল। বো চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। ওকে দ্রুত আমার কেবিনে পুরে বাইরে থেকে তালা মেরে দিলাম। যেই বুঝল ওকে বন্দী করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল বো, কাঁদতে কাঁদতে।

গ্রেভসের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। শুকনো গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

অবশ্য মিস চেস্টারকে দেখামাত্র মন ভাল হয়ে গেল গ্রেভসের। খানিক পর সম্ভবত সে ভুলেই গেল বো-র কথা।

মিস চেস্টারকে দেখে আবার মুগ্ধ হলাম আমি। ছবির চেয়েও সুন্দরী সে। এমন

একটি মেয়ের স্বামী হতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। গ্রেভস নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান।

ওদের বিয়েটা খুব দ্রুত এবং ছিমছাম ভাবে হয়ে গেল। কন্যা সম্প্রদান করলেন স্টীমারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি। ক্যাপ্টেন বিয়ে পড়ালেন। আর নাবিকরা সমস্বরে গাইল একটি মধুর-বিয়ের গান। শ্যাম্পেন আর কেক দিয়ে সারা হলো সকালের নাস্তা। শ্বেতশুভ্র পোশাক পরা পরীর মত মিস চেস্টার তার স্বামীর হাত ধরে লাজুক হেসে তীরে বাঁধা নৌকায় উঠল খানিক সমুদ্র ভ্রমণ করে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে। পরপর সাতাশবার পেতলের কামান দেগে অভিনন্দিত করা হলো নব দম্পত্তিকে। ওদেরকে নিয়ে নৌকা ভেসে পড়ল সমুদ্রে।

এত দ্রুত সব কিছু শেষ হয়ে গেল যে আমি খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলাম। ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। কোন কাজ নেই বলে বসে বসে রাইফেল আর রিভলভারটি পরিষ্কার করলাম। কিছুক্ষণ নোট লিখলাম দক্ষিণ সাগরের ঘাস সম্পর্কে। তারপরও কিছুই ভাল লাগছে না বলে ডনকে নিয়ে দিগম্বর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রে। অনেকক্ষণ হুটোপুটি করলাম সাগর জলে। তীরে উঠে চিৎ হয়ে পড়ে থাকলাম উজ্জ্বল সূর্যের নিচে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামল। উঠে পড়লাম আমরা। সোজা চলে এলাম লঞ্চে। ধীরে সুস্থে ডিনার খেলাম। তারপর আবার কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম বো-র অবস্থা দেখতে।

বুনো বেড়ালের মত ছুটে এল বো আমার দিকে। ঝট করে সরে গিয়েছিলাম বলে রক্ষে, নইলে নির্ঘাত কামড় খেতাম। কিন্তু তারপরও আমার প্যান্টের কাপড় ছিঁড়ে নিয়েছে বো। বিদ্যুৎগতিতে কাজ করল আমার পা, ধাঁই করে লাথিটা গিয়ে লাগল ওর গায়ে, ছিটকে কেবিনের এক কোনায় গিয়ে পড়ল বো। তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জ্বেলে নিলাম, সতর্ক একটা চোখ রেখেছি বো-র ওপর। ও একটা চেয়ারের নিচে গিয়ে ঢুকল। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। আমি আরেকটা চেয়ারে বসে কথা বলতে শুরু করলাম।

'এতে কোন লাভ হবে না,' বললাম আমি। 'তুমি বেহুদা আমাকে কামড়ে দিতে চাইছ। তুমি জানো তোমাকে এক লাথিতে আমি ভর্তা বানিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু তোমাকে মারতে চাই না। তারচে' আমার কাছে এসে বসো। এসো, আমরা বন্ধু হই। অবশ্য তুমি আমাকে পছন্দ করো না তা আমি জানি। আর আমিও যে তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারি না সে কথাও তোমার অজানা নয়। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে আমাদের সহাবস্থান করতেই হবে। আর ওটা যাতে ভালভাবে হয় সেই চেষ্টাই আমাদের করা উচিত। সুতরাং চেয়ারের নিচ থেকে বেরিয়ে এসো, আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করো। আমি তোমাকে বাদাম খাওয়াব।' বাদাম খাওয়ার লোভেই বোধহয় সে বেরিয়ে এল চেয়ারের তলা থেকে। আমি পকেট থেকে কিছু বাদাম বের করে মেঝেতে রাখলাম, ও দ্রুত এগিয়ে এল সামনে, কুটকুট করে খেতে লাগল ওগুলো।

এক মিনিটের মধ্যে বাদামগুলো সাবড়ে সে তাকাল আমার দিকে। তার চোখে অসীম বেদনা, যেন বলছে, 'আমি কি দোষ করেছি? আমাকে কেন তোমার সঙ্গে থাকতে হবে? আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। আমাকে গ্রেভসের কাছে যেতে দাও।'

আমি ওকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলাম। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন কাজ হলো না। তার চোখে আমার জন্যে উপচে পড়ছে ঘৃণা। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম। একটা বালিশ ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে। ইচ্ছে হলে ঘুমাবে। তারপর বেরিয়ে এলাম বাইরে। দরজা বন্ধ করতেই সে কান্না জুড়ে দিল। আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। খুব নরম গলায় ভাল ভাল ভালবাসার কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু সে আমার দিকে ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। উপুড় হয়ে শুয়ে একভাবে কাঁদতেই থাকল।

এবার মেজাজ চড়ে গেল আমার। ঘাড় ধরে ওকে শূন্যে তুলে ফেললাম। মাথা ঘুরিয়ে ও আমাকে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। আমি লক্ষ করলাম ও কাঁদছে, কিন্তু চোখে এক বিন্দু জল নেই। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে হলো। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে লাগলাম। জলকণার চিহ্ন মাত্র নেই চোখের তারায়। ওর ঘাড়টা বোধহয় খুব জোরে চেপে ধরেছিলাম আমি, ব্যথা পেয়ে ওর ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যেতে লাগল, বেরিয়ে পড়ল দাঁত।

এই সময় আমার গ্রেভসের গল্পটা মনে পড়ল। ঘাসের জঙ্গলে মৃত অবস্থায় যে মহিলাকে পাওয়া গিয়েছিল তার সমস্ত শরীর কালো হয়ে গিয়েছিল, দাঁতের দাগ ছিল পায়ের গোছের ওপর। ছোট ছোট দাঁত—বাচ্চাদের।

আমি জোর করে বো-র মুখ হাঁ করালাম। মোমবাতিটা দাঁড় করালাম মুখটার সামনে। কিন্তু ও এত বেশি শরীর মোচড়াচ্ছে যে বাধ্য হয়ে মোমবাতিটা মাটিতে রেখে ওর ঠ্যাং দুটো মুক্ত হাতটা দিয়ে চেপে ধরতে হলো। ইতিমধ্যে যা দেখার দেখে নিয়েছি আমি। সমস্ত শরীর আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল দ্রুত। একসারি ইঁদুরের দাঁতের দুই পাশে সূঁচাল দুই ছেদক দন্ত নিয়ে যে শরীরটা আমার হাতের মধ্যে মোচড় খাচ্ছে আর হিস হিস শব্দ তুলছে, ওটা কোন নারী শরীর নয়—বিষাক্ত একটা সাপ!

ওটাকে আমি একটা সাবানের পরিত্যক্ত কাঠের বাক্সে ঢুকিয়ে ওপরে কাঠের ছিলকা মেরে দিলাম। ওকে আসলে উচিত লোহার বাক্সে পুরে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া। কিন্তু গ্রেভসের সঙ্গে কথা না বলে কাজটা করা ঠিক হবে না ভেবে প্ল্যানটাকে আপাতত দূরে সরিয়ে রাখলাম।

কোন দুর্ঘটনায় যাতে পড়তে না হয় সে জন্যে আগেভাগে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ কে বলতে পারে বো-র ভাই ব্রাদাররা সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিতে আসবে না। তাই পকেটে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি, রাবার ব্যাণ্ডেজ এবং এক বাক্স পারমাঙ্গানেট ক্রিস্টাল (সাপে কামড়ানো রুগীর ফার্স্ট এইডের মহৌষধ) পুরে ডেকে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চমৎকার তারাজ্বলা রাত। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ঘুমটা জমবে ভাল, কিন্তু ঘুমাবার আগে বো-র অবস্থাটা একবার দেখে আসা উচিত ভেবে উঠে পড়লাম। দরজা বন্ধ করতে নিশ্চই ভুলে গিয়েছিলাম আমি। কারণ ভেতরে ঢুকে দেখি বো নেই। পালিয়েছে। মাথা দিয়ে আঘাত করেই বোধহয় সে নরম কাঠের বাক্সটা

ভেঙেছে। ওর শারীরিক সামর্থ্যকে এতটা অবজ্ঞা করা উচিত হয়নি আমার।

লঞ্চের লোকজন লণ্ঠন জ্বেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজল বো-কে। কিন্তু কোথাও ওর টিকিটিও দেখা গেল না। তার মানে জলে নেমে গেছে বো। অবশ্য সাপদের জন্য সাঁতার কাটা কোন সমস্যা নয়।

আমি ছোট একটা নৌকায় চড়ে দ্রুত তীরে চলে এলাম। ডনকে সঙ্গে করে, হাতে লোড করা শটগান নিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলাম তীর ধরে। পথ শর্টকাট করার জন্যে ঘাসের একটা জঙ্গলে ঢুকে দ্রুত এগোতে থাকলাম। হঠাৎ ডন কাঁপতে শুরু করল, ঘাসের গায়ে নাক লাগিয়ে কি যেন শুঁকছে।

'গুড ডন,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'গুড বয়, ওর পিছু নাও! খুঁজে বের করো ওকে!'

প্রকৃতি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আমরা গ্রেভসের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর থেকে ওর বারান্দায় দুই ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। দেখেই বুঝলাম গ্রেভস এবং তার বৌ। আমি ওকে সাবধান করার জন্যে মুখ খুলেছি, বলতে যাচ্ছি বো পালিয়ে গেছে এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, এই সময় তীক্ষ্ণ এবং তীব্র একটা চিৎকার বিস্ফোরণের মত আঘাত হানল কানে। দেখলাম গ্রেভস বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে গেল তার স্ত্রীর দিকে। মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে।

মিসেস চেস্টার এখনও জ্ঞান হারায়নি, দাঁতে দাঁত চেপে আছে, ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে। আমি তাড়াতাড়ি ওর পা থেকে খুলে ফেললাম মোজা। আঙুল এবং গোড়ালির মাঝের জায়গাটায় কামড় বসিয়েছে বো। বিষের ক্রিয়ায় ইতিমধ্যে জায়গাটা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। ডাক্তারি ছুরিটা দিয়ে আমি ক্ষতচিহ্নটা চিরে ফেললাম, ওষুধ লাগিয়ে জায়গাটা ব্যান্ডেজ করে দিলাম।

'গ্রেভস,' ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললাম। 'তোমার স্ত্রী যদি জ্ঞান হারাতে শুরু করে তাহলে অল্প অল্প করে তাকে ব্র্যান্ডি খাইয়ে দিয়ো। তবে ভয়ের কিছু নেই বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ ঠিক সময়ই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। আর শোনো, ভুলেও বলতে যেয়ো না কেন এবং কিসে তাকে কামড়েছে...।'

বলে আর দেরি করলাম না আমি। ডনকে বারান্দায় একটি খামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম। ও খুবই অস্থির হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ওর বাঁধন খুলে ছুটলাম বো-র পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে।

উজ্জ্বল চাঁদ দিন করে রেখেছে চারদিক। বালির ওপর বো-র ছোট ছোট পায়ের দাগ স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। ডনকে শোঁকালাম ওই দাগ, তারপর তাড়া দিলাম, 'খোঁজো ওকে, ডন! শিগ্‌গির খুঁজে বের করো।'

পায়ের দাগ ধরে আমরা ক্রমে ঢুকে পড়লাম দ্বীপের ভেতরের অংশে। ঘাসের গন্ধ তীব্রভাবে নাকে ধাক্কা মারছে। ডনের চলার গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে গেল, শরীর হয়ে উঠল আড়ষ্ট, তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করল। আমি মাথা বাড়ালাম। কিছুই চোখে পড়ল না, এদিকে ডন তার লেজের ডগা বিপুল বেগে নাড়তে শুরু করেছে, শরীরটা ক্রমশ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে লাগল, ঘন এক গোছা ঘাসের দিকে মাথাটা এগিয়ে নিল। এক পা সামনে বাড়াল ডন, ওর ডান

লেজটা উঠে গেল শূন্যে, ওভাবেই থাকল, যেন পঙ্গু হয়ে গেছে ওটা, লেজ নাড়ানো থেমে গেল একই সঙ্গে। শক্ত, লোহার মত হয়ে উঠল ওটা।

'দাঁড়াও, ডন!' প্রায় ফিসফিস করে বললাম আমি। শটগানটা স্থির করলাম ঘন ঘাস গোছাকে লক্ষ্য করে, ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ল···

'তোমার স্ত্রী এখন কেমন আছে?'

'আগের চেয়ে ভাল। পরপর দুটো গুলির শব্দ শুনলাম। শিকার মিলল কিছু?'

নেকড়ের ডাক

বন্ধু হিউগ ট্রাভেলানের সঙ্গে অনেক দিক থেকেই মিল আছে আমার। দুজনেই সমবয়সী, অবিবাহিত; দু'জনেরই রয়েছে চিত্রকলা এবং কারিগরী বিদ্যার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ। তবে আমার বুক শেলফগুলো দুষ্প্রাপ্য সব বইয়ে বোঝাই, কিন্তু ট্রাভেলানের সংগ্রহ ছিল অন্যরকম।

'এক পাগলের সঙ্গে আরেক পাগলের পরিচয় হোক,' ট্রাভেলানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় হাসতে হাসতে বলেছিল মেজর লজ। 'দু'জনে মিলবে ভাল। কারণ, ম্যাককে তুমি যেমন বইয়ের পোকা তেমনি ট্রাভেলানের পিস্তলের সংগ্রহ দেখলে যে কোন বন্দুকের দোকানদার ওকে ঈর্ষা করবে।'

'পিস্তল?' ট্রাভেলানের শক্ত হাতটা ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বললাম।

হাসল হিউগ ট্রাভেলান। নীল, বিষণ্ণ চোখ দুটো ঝকমকিয়ে উঠল। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'সব ধরনের রিভলভার: হুইল-লক, ফ্লিন্ট লক, মাজল-লোডারস, এমনকি ইদানীংকালের জটিল অটোমেটিক পর্যন্ত। দেখবেন আপনি?'

মানুষের শখ যে কত বিচিত্র হতে পারে এবং এর জন্য সে যে কত চড়ামূল্য দিতে রাজি! শুনেছি বুনোরাও নাকি রঙিন পাথর জমিয়ে গুপ্তধনের মত লুকিয়ে রাখে। ছোটবেলায় একবার আমি আমার বিদেশী স্ট্যাম্পের বইটা হারিয়ে মনের দুঃখে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিলাম। এখন সেসব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। ট্রাভেলানেরও জীবন হলো পিস্তল। সে প্রতিদিন তার ভারী মেহগনি কাঠের শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আপন মনে পিস্তলগুলোর গুণাগুণ বর্ণনা করে। ওগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করে, তেল দেয় আর প্রতিদিনই নতুন পিস্তল খুঁজে বেড়ায়।

ট্রাভেলানের সংগ্রহ সত্যি দেখার মত। মধ্য চতুর্দশ শতাব্দীর হাত-কামান থেকে শুরু করে লম্বা ব্যারেলের আধুনিক ল্যুগার পিস্তলও তার সংগ্রহে আছে। হালকা ফায়ার-আর্মসের এমন কোন নমুনা নেই যা তার শোকেসে স্থান পায়নি।

'এই জিনিসটা আমি গতকাল মিলড্রো'র দোকান থেকে কিনেছি,' একটা আর্মস তুলে নিল ট্রাভেলান। 'এটা একটা ইটালিয়ান স্ন্যাপহন্চ পিস্তল। আর এই ফ্লিন্ট লকস জোড়া লাজারিনো কমিনাজোর তৈরি। আর এই দেখুন ডাবল-নেকড হ্যামার পিস্তল। আর এটা একটা পুরানো হারকুইবাস, আর এই যে দেখছেন সোনার গিল্টি করা পিস্তলটা, এটা একটা ফ্রেঞ্চ হুইল-লক।'

যে আমি আমার দুষ্প্রাপ্য এবং দামী বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে সব সময় গর্ব করি সেই আমিও ট্রাভেলানের কালেকশন দেখে থ মেরে গেলাম। মনে হলো ওর এই সংগ্রহের কাছে আমারটা কিছুই না। কথাটা বললামও ওকে। গর্বিত হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'আপনার বইগুলো দেখার খুব আগ্রহ হচ্ছে আমার,' বলল সে। 'আমার কাছেও যুদ্ধাস্ত্রের ওপর কিছু বই আছে। তবে খুব পুরানো। ইচ্ছে হলে পড়ে দেখতে

পারেন। তবে কাজে লাগবে কিনা ঠিক জানি না। ওহ্‌হো, বলতে ভুলে গেছি, কালকেই আমি একটু দেশের বাইরে যাচ্ছি। সরি, এ যাত্রা আর আপনার সংগ্রহ দেখতে যাওয়া হলো না।'

'কতদিনের জন্য যাচ্ছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রাভেলান। 'অ্যারনশায়ারের একটা নির্জন এলাকায় বাড়ি ভাড়া করেছি। সম্ভবত পুরো গ্রীষ্মটাই ওখানে কাটাব। ডাক্তারের নির্দেশ, বুঝতেই পারছেন। আমার নাকি এখন কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। তবে একেবারে বেকার সময় কাটাব না। স্কচ পিস্তলের ওপর যে আর্টিকেলটা ধরেছি মাসখানেক আগে, এই সুযোগে ওটার কাজ শেষ করব ভাবছি। আর আপনার ইয়ে...যদি সময় করতে পারেন তাহলে চলে আসুন না আমার ওখানে? দু'জনে দিব্যি মজা করা যাবে।'

জুলাই'র প্রথম দিকে সুযোগটা হঠাৎই মিলে গেল। ব্যবসার পারমিটটা পেয়ে গেলাম। ভাবলাম ট্রাভেলানের ওখানে গিয়ে সেলিব্রেট করে আসি। কিন্তু গিয়েই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলাম। ব্লুমসবারিতে পৌঁছার পর, মিথ্যে বলব না, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম একটা। কেন? কারণটা ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার মন বলছিল ভয়ঙ্কর এবং অশুভ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ওখানে।

অ্যারনশায়ার জায়গাটা তার আশপাশের গ্রামগুলো থেকে আলাদা। লোকজনও যেন কেমন। রূঢ়, কর্কশ। পুরো গ্রামটাকেই মনে হয়েছে আদিম, হতছাড়া। পথের এখানে সেখানে বেড়া তুলে রেখেছে গ্রামবাসীরা। রোড মার্কিংগুলো কালের আঘাতে চেনা দায়, সেতুগুলো ভাঙাচোরা, গাড়ি চালাতে গিয়ে আমার সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে গেল।

মাইল দুয়েক যাওয়ার পর আপেল গাছ ঘেরা বাড়িটিকে চোখে পড়ল। পোস্টবক্সের নিচে লেখা, 'ব্লুকার হাউজ—লুদভিগ ব্লুকার, আন্ডারটেকার।'

ভিক্টোরিয়ান যুগের আদলে তৈরি বিশাল বাড়ি। সাজানো গোছানো হলেও জায়গায় জায়গায় রং চটে গেছে। সামনের লনে আগাছার ঝোপ, চারদিকে অযত্নের ছাপ সুস্পষ্ট।

'আরে, এসো, এসো,' আমাকে দেখে বারান্দা থেকে বেরিয়ে এল ট্রাভেলান। 'কেমন লাগছে?'

'আন্ডারটেকার লেখা ওই সাইনবোর্ডটা তুমি উঠিয়ে ফেলছ না কেন?' প্রত্যুত্তরে আমিও ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিলাম। 'পুরো বাড়িটাকেই মনে হচ্ছে একটা কবরখানা।'

আমাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল ট্রাভেলান। লক্ষ করলাম এখানেও সে তার প্রিয় পিস্তলগুলোকে নিয়ে আসতে ভোলেনি। বড় জানালাটার পাশে, লনের দিকে মুখ করে আর্মসগুলো সাজিয়েছে। মেহগনির শোকেসটাকে এই পরিবেশে আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকল। অদ্ভুত লাগল ট্রাভেলানকেও। পাশে বসে ওকে লক্ষ করতে লাগলাম আমি। সুদর্শন মুখখানা বাতির আলোতে মোমের মত তেলতেলে দেখাল, কেন জানি ওকে আমার রুমে ঝোলানো পেইন্টিং-এর ফরাসী অমাত্যের মত লাগল।

বাড়িটা ঘুরে দেখাল আমাকে ট্রাভেলান। কিন্তু ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

অশুভ কি যেন একটা আছে বাড়িটার মধ্যে, বারবার মনে হলো আমার। খুব অস্বস্তি হতে লাগল। কোনমতে দুটো দিন কাটিয়েই লন্ডনে ফিরে এলাম আমি।

গ্রীষ্মের সময়টাতে ট্রাভেলানের কাছ থেকে মাঝেমধ্যে চিঠি পেলাম। নির্জন পরিবেশটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে ও, চিঠিতে লিখল সে, স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে উঠছে দ্রুত। আগস্ট গড়িয়ে সেপ্টেম্বর এল, ট্রাভেলানের চিঠির সংখ্যা কমতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আসাই বন্ধ হয়ে গেল।

চেয়ারিং ক্রসের এক বইয়ের দোকানে বসে একটা বই ঘাঁটতে গিয়ে ট্রাভেলানের কথা আমার খুব মনে পড়তে লাগল। বইটা অনেক পুরানো তবে বাঁধাই চমৎকার। প্রচ্ছদে পেতলের টাইটেল, 'HISTORIE OF CERTAYNE SMALL FIRE ARMS' পুরানো আমলের কিছু পিস্তলের রঙিন ছবিও আছে। হাতে আঁকা। এই বই পেলে আমার বন্ধুটি কি পরিমাণ খুশি হবে ভেবে বেশ পুলক জাগল মনে।

পরদিনই আমি অ্যারনশায়ারে যাত্রা করলাম। রাস্তার পাশের গাছপালাগুলো, লক্ষ করলাম, ন্যাংটো হয়ে আছে সব। পাতাটাতা ঝরে পড়েছে, জানান দিচ্ছে এদিকটাতে শীত একটু তাড়াতাড়িই আসে।

রাত হয়ে গেল ট্রাভেলানের গ্রাম ডারসেটে পৌঁছুতে। কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ, ধুলোর ঝড় উঠল, বাতাস বয়ে আনল রাশি রাশি শুকনো পাতা। গাড়িটাকে প্রায় ঢেকে ফেলল। একটু পরেই টপটপ করে উইন্ডশীল্ডের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল। কিন্তু বৃষ্টিটাকে পাত্তাই দিলাম না। আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল কয়েকজন লোক।

একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, খুব উত্তেজিত। কথা বলছে জোরে জোরে। আমার পাশ দিয়ে কয়েকটা গাড়ি চলে গেল, আরোহীদের প্রত্যেকের হাতে শিকারী রাইফেল। এক বাড়ির দরজায় দেখলাম কয়েকটি লোক এক মহিলাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে। মহিলাটি ভীষণ কাঁদছে।

'কি হয়েছে?' গ্যারেজের লোকটার কাছে জানতে চাইলাম আমি। লোকটা আমার গাড়িতে পেট্রল ঢালছে।

'নেকড়ে,' জবাব দিল সে, চকিতে একবার চারদিকে চাইল। ভীত মনে হলো তাকে।

'নেকড়ে?' ঠাণ্ডা গলায় বললাম আমি। 'তুমি জানো, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ড থেকে নেকড়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে লোকটা আমার দিকে তাকাল, খানিকটা পেট্রল ছলকে পড়ল মাডগার্ডের ওপর। 'তাই নাকি, স্যার?' বলল সে। 'তাহলে ওটা কোন বুনো কুকুর কিংবা তারচেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু হবে।'

'তা ওটা কারও ওপর হামলা-টামলা করেছে নাকি?'

টাকাটা নিতে গিয়ে লোকটার হাত কেঁপে গেল, 'করেছে, ঘটেছে, স্যার। বিধবা মিসেস চেজের ফুটফুটে মেয়েটাকে নিয়ে গেছে।'

আমার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। 'তুমি বলতে চাইছ একটা বুনো কুকুর বাচ্চা মেয়েটাকে খুন করেছে?'

'ওই মেয়েটাই প্রথম নয়, স্যার। দিন পনেরো আগে আমাদের মুচির ছেলে জনিকে তো ওর মায়ের চোখের সামনে থেকে একরকম কেড়ে নিল। রাতের বেলা আসে ওটা। একা। বড়, ধূসর রঙ, চোখ দুটো জ্বলন্ত কয়লার মত। যারা দেখেছে তারা বলেছে, স্যার। জেফ টুইলগার তার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে ওটাকে গুলিও করেছিল। জেফ এখান থেকে ওই গাছের ওপরে রাখা শিলিং ফুটো করতে পারে, স্যার। কিন্তু ওটার গায়ে সে গুলি লাগাতে পারেনি। যে ওটাকে শিকার করতে পারবে তার জন্য পঞ্চাশ পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমিও আমার বন্দুকটা নিয়ে আসব ভাবছি।'

আমি আর কোন কথা না বলে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, গুড়ুম গুড়ুম বাজ পড়ছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে রাস্তার অবস্থা যাচ্ছেতাই হয়ে উঠল। বাধ্য হলাম স্পীড কমাতে।

ট্রাভেলানের বাড়িটাকে আগের চেয়েও ভৌতিক, অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠেকল। আমার হাতে এক গ্লাস লাইবফ্রাউমিলন ধরিয়ে দিল ট্রাভেলান। চুমুক দিতেই চাঙ্গা হয়ে উঠল শরীর।

'মদটা ভাল,' বলল ট্রাভেলান। 'তবে জিনিসটা আমি কিনিনি। আগে এই বাড়িতে যে বুড়ো অস্ট্রিয়ান থাকত, বোতলটা তার। লোকটা মারা গেছে, তুমি বোধহয় জানো। বাড়িটা নিলামে বিক্রি হবার কথা শুনে আমি আগেভাগেই কিনে নিয়েছি। খুব একটা খারাপ নয় বাড়িটা, কি বলো?'

আমি হাসলাম শুধু, গ্লাসটা নামিয়ে রাখলাম টেবিলে। 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাব বলে এসেছি,' ব্যাগটার দিকে হাত বাড়ালাম।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ট্রাভেলান, কি যেন মনে পড়েছে ওর। 'আমিও তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

একটা আয়তাকার বাক্স নিয়ে এল সে। বাক্সটা রূপোর, তবে মরচে ধরেছে। আমার সামনে, টেবিলের ওপর রাখল সে ওটা। খুলল। গর্বিত ভঙ্গিতে চাইল আমার দিকে. 'একটা মাস্টারপিসই বটে,' বলল সে। 'কোত্থেকে সংগ্রহ করেছি জানতে চাও? এই ডারসেট গ্রাম থেকেই।'

কালো ভেলভেট কুশনের ওপর জিনিসটা শোয়ানো, ঝিকমিক করে উঠল বাতির আলোতে। একটা পিস্তল। লম্বা ব্যারেলের ভারী সুন্দর একটা পিস্তল। বাঁটটা হাতির দাঁতের, হলুদ পাথরের মত জ্বলজ্বলে। রূপোর জটিল কাজ পিস্তলটাতে। ট্রিগারের ওপর মোজাইক করা অদ্ভুত ডিজাইন, আর ব্যারেলটা, বল্লমের ডগার মত সূঁচাল, সোনারঙ খোদাই করা। পিস্তলটার এক মাথায় সোনার ছোট্ট একটা ক্রুশ। তবে হ্যামারটা আমার নজর কাড়ল সবচেয়ে বেশি। কালো ইস্পাতের তৈরি, মাথায় একটা খুলির ছাপ।

'সুন্দর না?' ট্রাভেলান উঁকি দিল আমার কাঁধের ওপর দিয়ে।

'এই জিনিস তুমি ডারসেট থেকে কিনেছ?' বিশ্বাস হতে চাইল না আমার।

উদ্ভাসিত হলো ট্রাভেলানের মুখ। 'স্রেফ ভাগ্য বলতে পারো। এক গ্রামবাসীর কাছে ছিল জিনিসটা। পুরানো অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে ওটা বিক্রি করেছে। আমি তাকে দ্বিগুণ দাম দিয়েছি।'

বাক্স থেকে পিস্তলটা তুলে নিলাম আমি, হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, 'ইটালিয়ান?'

ট্রাভেলানের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'প্রশ্নটা করে মুশকিলে ফেললে আমাকে। আমি নিজেও ঠিক জানি না এটা কোথাকার। তবে ইটালিয়ান হবে বলে মনে হয় না, আর জার্মানীর হওয়ারও কোন চান্স নেই। লোকটা বলল পিস্তলটা নাকি তাদের ঘরে বহুদিন ধরে পড়ে ছিল।'

পাইপ ধরালাম আমরা, ধূমপান করতে করতে টুকটাক কথা বলতে লাগলাম। ট্রাভেলান পুরানো অস্ত্র সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা শুরু করতেই আমি তাড়াতাড়ি ওর জন্য নিয়ে আসা বইটা ওকে দিলাম। সাবধানে পাতা ওল্টাতে লাগল ট্রাভেলান, ছবিগুলোর দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'চমৎকার একটা বই,' বলল সে। 'আমি—'

থেমে গেল ট্রাভেলান. ওর চোখ দুটো বড়সড় হয়ে উঠল। বিস্মিত একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে, টেবিল ল্যাম্পটা টেনে আনল বইটার দিকে।

'এই পৃষ্ঠাটা দেখো, ম্যাককে,' উত্তেজনায় গলা বসে গেল ওর। 'এখানটা পড়ো।'

পরিচ্ছদটা দেখলাম আমি। 'EARLY EIGHTEENTH CENTURY'। মাঝ পৃষ্ঠায় আঙুল দিয়ে দেখাল ট্রাভেলান। পড়তে শুরু করলাম আমি:

প্রাগের ওস্তাদ কারিগর জোহান স্টিফটার এর সর্বাপেক্ষা অসাধারণ কাজ হইল ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের জমিদার স্যার উইলিয়াম কিংস্টোনের জন্য তৈয়ারি একটি হোলস্টার পিস্তল। এই অস্ত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে তৈরি করা হইয়াছে রৌপ্য নির্মিত গুলি ছোঁড়ার উদ্দেশ্যে। এই অস্ত্রটি সাতজন সন্ন্যাসী কর্তৃক আশীর্বাদপুষ্ট এবং পবিত্র জল দ্বারা সিক্ত। ইহার ব্যারেলে অঙ্কিত আছে মহান যীশুর ক্রুশ। জনশ্রুতি আছে, স্যার উইলিয়াম প্রায়শ দক্ষিণ দেশ সমূহে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইতেন। এমনই এক ভ্রমণকালে তাঁহাকে কিছু নেকড়ে আক্রমণ করে, ইহারা 'ওয়্যারউলভ্' বলিয়া পরিচিত। শয়তানের দোসর এই নেকড়েরা মনুষ্য রূপ ধারণ করিতে পারে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। উক্ত হামলাকালে নেকড়েরা স্যার উইলিয়ামকে মারাত্মকভাবে আহত করিয়া তাঁহার কন্যা জুলিকে ধরিয়া লইয়া যায়। ওই শয়তানদের সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি তখন এই বিশেষ পিস্তলটি তৈয়ারি করার নির্দেশ দেন।'

লেখাটার নিচেই একটা পিস্তলের ছবি। সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, এটা হুবহু একটু আগে দেখা ট্রাভেলানের পিস্তলের মত।

বর্ণনায় কোন ভুল নেই। একই রকমের দুটো পিস্তল তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবুও ব্যাপারটা সত্যি কিনা জানার জন্য একটা প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। বইতে আছে কারিগর তাঁর পিস্তলের ওপর পাঁচটি শব্দ খোদাই করে গেছেন: TOD DEM WEHRWOLF SCHWORE ICH (আমি শপথ করে বলছি ওয়্যার উলফদের ধ্বংস অনিবার্য)।

'ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। ট্রাভেলান-এর চেহারা আমূল পাল্টে গেছে। মুখটা সাদা, চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। মুঠি দুটো বারবার খুলছে

৯ার বন্ধ করছে। উঠে দাঁড়াল ও, সামান্য টলে উঠল।

'একটা ছিল তো! খুঁ-খুঁজতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর গ্লাসটা দিয়ে পিস্তলটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। খুদে লেখাগুলো স্পষ্ট চেনা গেল ব্যারেলের গায়ে।

'এই তো!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'এটা তো সেই একই পিস্তল।'

ট্রাভেলানের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে ঘুরলাম ওর দিকে। টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে আছে ও, আড়ষ্ট। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সে পিস্তলটা, ঢোকাল বাক্সে, রেখে দিল মেহগনির শোকেসে।

'শরীর খারাপ লাগছে?' বললাম আমি।

'হ্যাঁ,' একটা ঝাঁকি খেল যেন ট্রাভেলান। 'আ-আমার মাথাটা কেমন জানি ঘুরছে। সকালে প্রচুর হেঁটেছি বলেই হয়তো এমন লাগছে। যদি কিছু মনে না করো, আমি এখন একটু বিশ্রাম নেব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ট্রাভেলান। আমি বেশ অবাক হলাম। হঠাৎ হলো কি লোকটার? পিস্তলের ওপরে লেখাটা পড়ার আগেও তো দিব্যি স্বাভাবিক দেখলাম। পাইপ টানতে টানতে ট্রাভেলানের অদ্ভুত আচরণের কথা ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ বজ্রপাতের শব্দে আমার ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। ঝড়ের বেগ আরও বেড়েছে। জানালার শার্সিতে বৃষ্টির ছাঁট আছড়ে পড়ছে। বাইরে ঘন, কালো অন্ধকার। আনমনে বৃষ্টি দেখতে দেখতে আবার চিন্তায় ডুবে গেলাম।

ওয়্যারউলফ! মানুষ কল্পনায় কত কিছুই না তৈরি করে। তারা বিশ্বাস করে কোন লোক কোন মানুষের রক্ত পান করলে নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়। পবিত্র জল, ক্রুশ কিংবা সিলভার বুলেট ছাড়া নাকি শয়তান নেকড়েকে হত্যা করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ ইউরোপের অনেক দেশের মানুষ এখনও এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে, জানি আমি।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই পাইপটা পিছলে গেল ঠোঁট থেকে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম আমি। ডারসেটের গ্যারেজের ওই লোকটা কি বলেছিল? বলেছিল গ্রামে নাকি একটা নেকড়ে ঢুকেছে, দুটো বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গেছে।

প্রশ্নটা বারবার জেগে উঠল মনে, ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাইলাম ভাবনাটাকে, কিন্তু ছিনে জোঁকের মত মগজে সেঁটে থাকল ওটা। ধূসর রঙের এই নেকড়েটা আবার কোন ওয়্যারউলফ নয়তো?

জোর করে হাসলাম আমি। নিজেকে তিরস্কার করলাম। এসব কি ছাইপাঁশ ভাবছি আমি? পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ডে নেকড়েদের 'ন'ও নেই। তাহলে এই প্রাণীটার বুনো কুকুর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদি এটা কুকুরই হয় তাহলে ওটাকে নিশ্চই কেউ না কেউ পুষত আর এই খবরটা গ্রামবাসীদেরও জানার কথা। কপাল কোঁচকালাম আমি। উঁহুঁ, ওটা দূরের কোন অঞ্চল থেকেও আসতে পারে। হয়তো মালিক ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কুকুরটা যতই বন্য হোক, হাঁস মুরগির খামারের ওপর আক্রমণ চালাবে সে, মানুষের রক্তভৃষ্ণায় তার মেতে ওঠার কথা নয়। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। আমি একঠায় চেয়ে থাকলাম পাইপের দিকে। কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পেলাম না।

ঘরটার একধারে একটা বুকশেলফ চোখে পড়ল আমার। বিক্ষিপ্ত মন শান্ত করার জন্য বইয়ের বিকল্প নেই। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। শেলফের দিকে এগোলাম। বইগুলো দেখতে গিয়ে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলাম। দুই ডজন বইয়ের সবগুলো ভূত প্রেত আর যাদুবিদ্যার ওপর লেখা। রিচার্ড ভার্সটেগানের 'RESTITUTION OF DECAYED INTELLIGENCE' চোখে পড়ল। দেখলাম উদ্ভট নামের অধিকারী লেখকদের কিছু বই, এঁরা সবাই বহু আগেই মারা গেছেন। দুষ্প্রাপ্য কিছু প্রকাশনা নজর কাড়ল। এই বইগুলো অনেক আগে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে লি লোয়ারের 'BOOK OF SPECTRES' বাসলেতে প্রকাশিত 'DE PRAESTIGIES DAEMONUN ET INCANTATIONI-BUS'-এর ষষ্ঠ মুদ্রণ, এবং মিলো ক্যালুমেন্টের পৈশাচিক গ্রন্থ 'I AM A WEREWOLF'। এই বইয়ের সমস্ত কপি, যতদূর জানি, হব্লটন জলাভূমিতে ফেলে দেয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা ভেবে অবাকই লাগল যে ট্রাভেলান ভাল করেই জানে এই সব বইয়ের খবর আমাকে জানালে কি খুশিই না হতাম আমি। আরও অবাক হলাম, এই ধরনের বইয়ের দিকে ঝুঁকল কেন ট্রাভেলান, এর মধ্যে তো পিস্তল সম্পর্কিত একটা অক্ষরও লেখা নেই। তাহলে?

একটা বইয়ের দিকে চোখ আটকে যেতেই উত্তরটা তৎক্ষণাৎ পেয়ে গেলাম আমি। এগুলো আসলে ট্রাভেলানের সম্পত্তি নয়। বইগুলোর প্রকৃত মালিক লুদভিদ ব্লুকার, এই বাড়ির প্রাক্তন মালিক। সূচীপত্রে তার নাম লেখা। বইগুলো ট্রাভেলানের নজর এড়িয়ে যায়নি। হাতের বইটার পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলাম আমি। কি সব যেন লিখে রেখেছে ট্রাভেলান ভেতরের পৃষ্ঠায়। এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম আমি। কৌতূহলী হয়ে পড়তে শুরু করলাম ওর হিজিবিজি লেখা:

'জুলাই ৩১, আজ রাতে আমি সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করেছি। অনুভব করছি আমার ভেতরে সেই অজানা শক্তির বিস্ফোরণ। ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু জানি এটাই বাস্তব সত্য। কে যেন আমাকে খালি গ্রামের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরুবার সাহস পাচ্ছি না আমি। এই ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের সঙ্গে আগে আমাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।'

মনের গভীরে ক্ষীণ সন্দেহের এক টুকরো মেঘ জমে উঠল, আমি দ্রুত বইটার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে গেলাম যদি আরও কিছু চোখে পড়ে। কিন্তু অর্থহীন, হিজিবিজি কয়েকটা দাগ পেলাম শুধু, বাকিটা ল্যাটিনে লেখা; আর এই ভাষাটা আমি জানি না।

বিস্মিত আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম, ঢুকলাম শোবার ঘরে। জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

শোবার সঙ্গে সঙ্গে এতকাল ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু আজ অনেকক্ষণ জানালার দিকে চেয়ে থাকলাম, বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে ছায়া ফেলল দেয়ালে। কিন্তু ঘুম এল না। নির্ঘুম আমি শুনছি দেয়াল ঘড়ির একঘেয়ে টক্‌টক্‌ শব্দ।

রাত আরও গভীর হলো। ঘড়িটার পেণ্ডুলাম একভাবে শব্দ করেই চলেছে। হঠাৎ ট্রাভেলানের শোবার ঘরের দরজা ক্যাঁচকোচ করে উঠল, কে যেন খুলছে

ওটা। একটু পরেই হালকা পায়ের শব্দ ভেসে এল হলঘর থেকে। দ্রুত উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে, দরজাটা সামান্য খুলে ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম বাইরে।

হলঘরের শেষ মাথায় একটা বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। আবছা আলোতেও স্পষ্ট দেখলাম ট্রাভেলানকে, পুরো পোশাক পরনে, সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু ওর হাঁটার ভঙ্গিটি খুবই রহস্যময়। যেন পরের বাড়িতে চুপিচুপি ঢুকেছে সে। প্রতিটি পা ফেলছে সাবধানে, থামছে, সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে, কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। সিঁড়ির প্রথম সারিতে পা রাখল ট্রাভেলান, এই সময় ওর মুখখানা দেখতে পেলাম আমি।

ভয়ঙ্কর, অশুভ কি যেন একটা ঠিকরে বেরোচ্ছে ওর চেহারা থেকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, যেন ফাঁকা হাসি হাসছে। এক পলকের জন্য সে তাকাল আমার দরজার দিকে; তারপর নামতে শুরু করল।

এক মুহূর্ত আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম ওখানে, সীমাহীন অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছি। মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় শুরু হলো। লোকটার কি ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস আছে? কিন্তু নিশি পাওয়া মানুষের মত তো মনে হলো না ট্রাভেলানের আচরণ। তাহলে এত রাতে চোরের মত কোথায় যাচ্ছে সে?

তীব্র ইচ্ছে জাগল মনে ট্রাভেলান কোথায় যাচ্ছে দেখার জন্য। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে, খুললাম দরজা। বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ল মুখে। সামনে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। হঠাৎ সাপের জিভের মত লকলকিয়ে উঠল বিদ্যুৎ। আলোকিত হয়ে উঠল সামনের পথটুকু। এই সময় দেখলাম আমি ওটাকে। বাগানের পথ ধরে রাস্তার দিকে যাচ্ছে ধূসর রঙের বিশাল একটা নেকড়ে; বিদ্যুতের আলোতে এক মুহূর্তের জন্য ঘুরে দাঁড়াল ওটা, চোখ দুটো দেখতে পেলাম আমি। যেন দু'টুকরো গনগনে কয়লা, বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর! জীবনেও ভুলব না আমি এই চোখের দৃষ্টিকে।

আবার নেমে এল অন্ধকার। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম দোরগোড়ায়। স্থির, আতঙ্কিত। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম নিজের ঘরে। চেয়ার টেনে বসে পড়লাম জানালার কাছে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বাইরে। জবাবহীন অসংখ্য প্রশ্ন হাতুড়ির বাড়ি দিতে শুরু করল মস্তিষ্কে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল এভাবে। তারপর ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ঘুম ভেঙে দেখি প্রথম ভোরের হালকা আলো এসে ঢুকেছে ঘরে। ঝড় থেমে গেছে, আল বেয়ে পানি গড়িয়ে জমে আছে গর্তে। আকাশে তামাটে রঙ। সোঁদা আর ভেজা গন্ধ এসে ঢুকল নাকে।

ঠিক তখন শব্দটা শুনলাম আমি, ভেসে এল দূরের গ্রাম থেকে। ভোরের বাতাস চিরে দিল এক ভয়াল ডাক। ডাকটা ক্রমে বাড়তে লাগল, আরও স্পষ্ট শোনা গেল। রয়াল উডসে খেঁকশিয়াল শিকারে গিয়ে ওরকম ডাক আমি হাউন্ডদের গলায় শুনেছি। কিন্তু এই ডাক তারচেয়েও অনেক তীক্ষ্ণ, তীব্র। এই চিৎকার নেকড়ের, আর ওটা দ্রুত এদিকেই এগিয়ে আসছে।

শক্ত করে মুঠো চেপে ধরে আমি বসে থাকলাম। একমুহূর্ত পর ডাকটা ঠিক আমার জানালার নিচে শোনা গেল। ধূসর রঙের বিশাল শরীরটার দিকে চোখ পড়তেই আতঙ্কে কেঁপে উঠলাম আমি। ওটা চারদিকে একবার মাথা ঘোরাল, মুখ

দিয়ে 'আউউ' শব্দ বেরিয়ে এল, তারপর ঘুরে বাড়িটার অন্য দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর সদর দরজা খোলার শব্দ শুনলাম আমি। সিঁড়ি বেয়ে কে যেন উঠে আসছে ওপরে। আমি উঠে দাঁড়ালাম, খুললাম দরজা।

হিউগ ট্রাভেলান ঢুকছে হলঘরে। তবে তার আচরণে এখন চোর চোর ভাবটা নেই। বরং কি কারণে জানি ওকে খুব উত্তেজিত মনে হলো। নিজের ঘরে ঢোকার আগে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে দেখল সে।

শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল আমার। মুখ হাঁ হয়ে গেল, অনেক কষ্টে তীব্র চিৎকারটাকে দমন করলাম। ট্রাভেলানের মুখটা দেখেছি আমি ঈশ্বর, ওর ঠোঁটে লেগে আছে টকটকে লাল রক্ত!

অনেক সময় লাগল নিজেকে চেক দিতে। কিন্তু নাস্তা খাওয়ার টেবিলে বসে লক্ষ করলাম এখনও থেকে থেকে আমার হাত দুটো কেঁপে উঠছে।

'গুড মর্নিং, ম্যাককে,' বলল ট্রাভেলান। 'ঝড়বৃষ্টি আশা করি তোমার ঘুমের তেমন একটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।'

লোকটার তেলতেলে মুখে পরিতৃপ্তির হাসি দেখে আমার পেট ঠেলে বমি আসতে চাইল। কোন কথা বললাম না। ব্যাপারটা বোধহয় লক্ষই করল না সে। একনাগাড়ে একাই কথা বলে গেল, হাসি ঠাট্টা করল, যেন ড্রাগ খেয়ে এসেছে।

চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার সময় ট্রাভেলানকে ভাল করে লক্ষ করলাম আমি। ওর গাল দুটো চকচক করছে, ভাল স্বাস্থ্যের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। তারপরও কোথায় যেন ওর একটা ক্ষীণ পরিবর্তন হয়েছে, মনে হলো আমার। চেহারাটা আগের মতই আছে, নীল চোখ দুটো এখনও পুতুলের মত সরল। হঠাৎ করেই পরিবর্তনটা ধরতে পারলাম আমি। পরিবর্তনটা ঘটেছে ওর মাথায়। ওর নিখুঁত করোটির গঠন সবসময় মুগ্ধ করেছে আমাকে। কিন্তু লক্ষ করলাম, কপালটা এখন কেমন যেন সরু হয়ে এসেছে, কানদুটো হয়ে উঠেছে বড়, লম্বা এবং সূচালো। আর নাকটা, মনে হলো আমার, ওটাও বড় হয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে দু'পাশে।

'ট্রাভেলান,' নাস্তা খাওয়া শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'লুদভিগ ব্লুকার লোকটা আসলে কে ছিল?'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল ট্রাভেলানের। 'এই বাড়ির প্রাক্তন মালিক,' বলল সে। 'চলো আমরা রাস্তায় খানিকটা হেঁটে আসি।'

'আমিও জানি সে এই বাড়ির প্রাক্তন মালিক,' ওর সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম আমি। 'কিন্তু লোকটা কৃষক ছিল নাকি আন্ডারটেকার?'

'দুটোই,' বলল ট্রাভেলান। 'সে জমিতে ফসল ফলাত আর গ্রামের লোকজনের আত্মীয়স্বজনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজে সাহায্য করে অল্প স্বল্প পয়সাপাতিও আয় করত।'

বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা নিয়ে ট্রাভেলান আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। কিন্তু থামলাম না। বললাম, 'গতকাল রাতে লোকটার কিছু বইপত্র ঘেঁটে দেখলাম। কি কালেকশন! কিন্তু ব্লুকারও দেখছি বোকার মত ভূত প্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করত।'

ট্রাভেলান ঘোঁৎ শব্দ করে আমার দিকে ঘুরল।

'লোকটা মহান ছিল,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'গ্রামবাসীরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত কারণ—সে একা থাকত আর যে সব বই সে পড়ত তাতে দাঁত ফোটাবার সাধ্য এই মূর্খ গ্রামবাসীদের ছিল না। এই বই সংগ্রহ করতে ব্লুকারের অনেক বছর সময় লেগেছে। ওর সম্পর্কে না জেনে কোন আলতু ফালতু মন্তব্য করবে না।'

বাগানের শেষ মাথায় পৌঁছে গেলাম আমরা। ছোট ছোট লাফ দিয়ে জলভরা গর্তগুলো পেরোলাম। পোস্টঅফিসের রাস্তায় আসতেই দু'জন লোককে দেখলাম ঘোড়ায় চড়ে এদিকেই আসছে।

'সুপ্রভাত,' লম্বা লোকটা বলল। একে আমি এই গ্রামে আগেও একবার দেখেছি, মনে পড়ল।

'সুপ্রভাত। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, দেখেছেন?'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ,' তার কণ্ঠ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'কোন নেকড়ে কিংবা বুনো কুকুর নিশ্চই আপনার চোখে পড়েনি, তাই না?'

টের পেলাম ঘাম জমে উঠেছে আমার কপালে। 'ডারসেটে ওটা আবার কারও ওপর হামলা চালায়নি তো?'

'চালিয়েছে,' বলল সে। 'গতরাতে এক বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকেছে। দিন দিন শয়তানটার সাহস বেড়েই চলেছে। মায়েরা এখন তাদের বাচ্চাদের ওপর বাজপাখির মত শ্যেন নজর রাখছে। অন্তত দশটা দল বেরিয়েছে পিশাচটার সন্ধানে।'

'গতকাল ক'জন মারা পড়ল?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'দু'জন। জেপসনের জমজ বাচ্চা দুটো। খুবই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, স্যার।'

'ওটাকে যদি ধরতে পারি আমি,' বললাম আমি, 'জ্যান্ত ছাল ছাড়াব।'

কষ্ট করে হাসল যেন লোকটা। 'তাহলে একশো পাউন্ড পুরস্কার পাবেন, স্যার। আর ডারসেটের প্রতিটি মা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।'

লোকদুটো চলে গেল। ট্রাভেলান আমার দিকে আড়চোখে চাইল। হাসিখুশি ভাবটা সম্পূর্ণ উধাও ওর চেহারা থেকে, ওখানে ফুটে উঠেছে রাজ্যের ভয়।

'আ-আমাদের বোধহয় এখন ফেরা উচিত,' বলল সে। 'আমার কিছু লেখালেখির কাজ বাকি আছে।'

বাড়িতে পৌঁছুতেই ট্রাভেলান ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘরটাতে ঢুকতেই মনে হলো কে যেন এখানে ওঁৎ পেতে আছে, প্রথম সুযোগেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। আমি ট্রাভেলানের গান কেসের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাঁচের দরজা দিয়ে ভেতরের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ট্রাভেলানের সাম্প্রতিকতম সংগ্রহ রূপোর বাক্সটার দিকে চোখ আটকে গেল। ওটার মধ্যেই আছে হাতির দাঁতের সেই পিস্তল।

দ্রুত শোকেসটা খুললাম আমি। বাক্স খুলে বের করে আনলাম অস্ত্রটা। পুরানো মদের মত জিনিসটা আকর্ষণ করছে আমাকে। বারবার ওটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। ভেলভেটের বাক্সের একপাশের খোপে তিনটে সিলভার বুলেট এবং লোডিং ইকুইপমেন্ট। এক সেকেন্ড ইতস্তত করলাম, তারপর একটা সিলভার বুলেট

তুলে নিলাম খোপ থেকে, গুলিটা পিস্তলের মধ্যে ঢোকালাম, গান পাউডার ঠেসে ভরলাম ওটার মধ্যে। তারপর লোড করে আবার আগের জায়গায় রেখে দিলাম।

সন্ধ্যার পরে ট্রাভেলান আমার ঘরে এল।

'আমি দুঃখিত, ম্যাককে,' বলল সে। 'আমাকে বিশেষ একটা কাজে গ্রামে যেতে হচ্ছে। রান্নাঘরে কফি আছে। গরম করে খেয়ে নিয়ো। ফিরতে দেরি হতে পারে। কাজেই আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না।'

দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ট্রাভেলানের পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে একটা ভয় জেগে উঠল আমার মধ্যে। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলাম। বাইরে তাকালাম। আকাশে বড় বড় কালো মেঘ, প্রায়ই চাঁদকে ঢেকে ফেলছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসহ্য প্রহর কাটতে লাগল। ঘড়ির পেণ্ডুলামের আওয়াজ বিস্ফোরণের মত কানে বাজছে। তীব্র আগ্রহ জাগছে ট্রাভেলানের গানকেস খুলে পিস্তলটা আবার হাতে নিতে।

হঠাৎ আওয়াজটা শুনতে পেলাম আমি। গ্রামের দিক থেকে ভেসে আসছে। সমস্বরে চিৎকার করছে কারা যেন, ড্রাম বাজাচ্ছে। পরক্ষণে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। নেচে উঠল রক্ত। সঙ্কেত! শিকারের সঙ্কেত দিচ্ছে গ্রামবাসীরা, সবাইকে জাগতে বলছে। অবশেষে উপস্থিত হয়েছে ভয়াল মুহূর্তটি!

কান পেতে ড্রামের আওয়াজ শুনছি, এই সময় শব্দটাকে ডুবিয়ে দিয়ে ভেসে এল সুতীক্ষ্ণ, সুতীব্র এবং ভয়ঙ্কর এক চিৎকার—ডাকছে নেকড়ে!

আমি তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, নিচের দিকে চাইলাম। ঘন মেঘের আড়ালে চাঁদটা লুকোচুরি খেলছে। মেঘের বিশাল ছায়া পড়েছে বাগানে।

হঠাৎ পূর্ণ আলোতে ভেসে উঠল চাঁদ। আমি তখুনি ওটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে কুৎসিত জীবটা, মুখটা লালরঙে মাখামাখি।

গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার। পরক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। এক দৌড়ে গিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকলাম। হাতির দাঁতের তৈরি পিস্তলটা চুম্বকের মত আকর্ষণ করল আমাকে. টের পেলাম অজানা একটা শক্তি যেন ভর করেছে আমার ওপর।

আমি হাত বাড়ালাম সামনে, খুলে ফেললাম শোকেসের কাঁচের পাল্লা।

'ট্রাভেলান!' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'ট্রাভেলান! ফিরে যাও!'

নেকড়েটা লাইব্রেরি ঘরের সামনে চলে এসেছে। মাথা তুলে চাইল। সাপের মত ছোবল মারল আমার হাত, এক ঝটকায় বাক্স থেকে তুলে নিলাম পিস্তলটা। বুড়ো আঙুল দিয়ে হ্যামার টানলাম। ট্রিগারের ওপর চেপে বসল তর্জনী।

'ট্রাভেলান!' গলা ভেঙে গেল আমার চেঁচাতে গিয়ে। 'ঈশ্বরের দোহাই, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না।'

পরক্ষণে গুলির কান ফাটানো শব্দ। কাঁচের টুকরোগুলো ঝনঝন করে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। বাগান থেকে যন্ত্রণাকাতর একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম আমি।

ছুটে গেলাম নিচে। পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে পা বাড়ালাম বাগানের দিকে

ঘুরতেই ওর ওপর চোখ পড়ল আমার। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর। জামা ভিজে গেছে তাজা খুনে। আমি তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা কোলে তুলে নিলাম।

'ধন্যবাদ, ম্যাককে,' অনেক কষ্টে মাথা তুলে ফিসফিস করে বলল সে। 'এটা…এটাই একমাত্র পথ ছিল।'

তারপর একটা শ্বাস ফেলে আবার নেতিয়ে পড়ল সে, স্থির হয়ে গেল শরীর। আমি হিউগ ট্রাভেলানের লাশ কোলে নিয়ে বসে থাকলাম বাগানে। একা।

দোসরা অক্টোবর 'লন্ডন ক্রনিক্‌ল্'-এর সান্ধ্য সংখ্যায় একটি খবর ছাপা হলো। খবরটি এরকম:

'উত্তর অ্যারনশায়ারের কাছে, ডারসেট গ্রামে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন। বিখ্যাত পিস্তল সংগ্রহকারী মি. হিউগ ট্রাভেলানের লাশ তাঁর গ্রীষ্মকালীন আবাসে আবিষ্কার করেছেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্লুমসবারির রাসেল স্কোয়ারের মি. মার্টিন ম্যাককে। তিনি লন্ডন থেকে বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলেন ছুটি কাটাতে। লাশের শরীর পরীক্ষা করার পর বিভাগীয় ডাক্তার মন্তব্য করেছেন যে, মি. ট্রাভেলান তাঁর একটি অস্ত্র পরিষ্কার করার সময় অসাবধানতাবশত ট্রিগারে হাত দিয়ে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলির আঘাতে প্রাণ হারান। তবে অবাক ব্যাপার হচ্ছে, সেটি ছিল একটি সিলভার বুলেট।'

শেষ যাত্রা

নভেম্বরের সন্ধ্যা। তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস চাবুক কষাচ্ছে সুউচ্চ পাহাড়গুলোর চুড়োয়। ঝিরঝির তুষার বাইরে, লঝঝরে ভ্যানের মধ্যে বসা জেব ওয়াটারস শীতে কাঁপতে কাঁপতে তার ভেড়ার চামড়ার কোটের কলার গলা পর্যন্ত টেনে দিল। সারাদিন আজ মুখ গোমড়া করে ছিল আকাশ, পুঞ্জীভূত কালো মেঘের ছড়াছড়ি প্রকৃতিকে করে তুলেছে বিষণ্ণ। মেঘের রং এখন ধূসর, অনেকটা নিচে নেমে এসেছে, যেন বরফের পর্দা হয়ে ঝুলে আছে দূরের পাহাড়গুলোর মাথায়। ডানদিকে ইস্টার্ন স্টেটস পাওয়ার লাইনসের সুবিন্যস্ত টাওয়ারের সারি, এইচ জি ওয়েলসের কোন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতই; বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে যোগসূত্রতার একমাত্র প্রমাণ। ঝড়ো হাওয়ায় কেঁপে উঠছে বৈদ্যুতিক তার। মৃদু গোঙানির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

গাড়ির জানালা দিয়ে উদ্বিগ্নমুখে আকাশ দেখল জেব ওয়াটারস। 'ফেরার সময় অঢেল ঝামেলা হবে মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করল সে। 'প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হতে পারে।'

এঞ্জিনে আরও গ্যাস ঢোকাল জেব, শক্তমুঠোয় চেপে ধরল হুইল। হঠাৎ একটা খাড়া বাঁক সাঁৎ করে দৃশ্যমান হলো সামনে। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে, তবু সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত নগ্ন পাহাড় আর ঢালগুলোতে। মারচেস্টার আরও ত্রিশ মাইল দূরে, সুদীর্ঘ এবং সর্পিল। লিটলটন মাত্র পেছনে ফেলে এসেছে সে। ঝড় হবার যেহেতু যথেষ্ট সম্ভাবনা কাজেই তার উচিত হবে শহরে ফিরে যাওয়া। কাল সকালে যাত্রা করলেই হলো। এখানে বেহুদা বসে থেকে লাভ নেই, বিশেষ করে যে জিনিস সে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছে সেটিকে নিয়ে। ওটার কথা ভাবতেই এই দেখো কেমন শিরশির করে উঠল গা।

মারচেস্টারের লোকসংখ্যা খুবই কম। আর লিটলটনের পর ওটাই কাছে পিঠের একমাত্র শহর। জেব ওয়াটারস সপ্তাহে দুইদিন ওখানে যায় শহরবাসীদের জন্য রসদপত্র নিয়ে। যাত্রীও বহন করে সে। তবে ফিরতি পথে বেশির ভাগ সময় তাকে যাত্রীশূন্য অবস্থায় ফেরত আসতে হয়। আজকের অবস্থা ভিন্ন। আজ খুব জরুরী একটি জিনিস তাকে বহন করতে হচ্ছে। তার ভ্যান গাড়ির পেছনে, কফিনে, শুয়ে আছে ফিলিপ কার, মারচেস্টারের সবচেয়ে জনপ্রিয় তরুণ। 'রেস কার' নামেই ফিলিপের পরিচিতি ছিল সর্বাধিক। কারণ কার রেসিঙে তার মত দুর্ধর্ষ ড্রাইভার গোটা শহরে কেউ ছিল না। বছর তিনেক আগে অনেক খেটেখুটে সে একটা গাড়ি তৈরি করেছিল। নাম দিয়েছিল 'স্পীড এমপ্রেস।' ফ্লোরিডার ডেটোনা বীচে ভেল্কি দেখাতে চেয়েছিল ফিলিপ। চেয়েছিল নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে। ঘণ্টায় ৩০০ মাইল ছিল তার গাড়ির গতি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ফিলিপ কারের। প্রতিযোগিতার দিন তার গাড়ির একটা চাকা ছুটে যায়, মুহূর্তে ওটা পরিণত হয় একতাল ইস্পাতে। দুর্ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে মারা

য়ে ফিলিপ। ফ্লোরিডায় তাকে সমাধিস্থ করার কথা বলা হলেও তার নিজের শহর মারচেস্টারের অধিবাসীরা সবাই প্রতিবাদ জানায়। না, ফিলিপের কবর হবে তার নিজ বাসভূমে। তখন ফ্লোরিডার সবচেয়ে কাছের শহর লিটলটনে নিয়ে আসা হয় ফিলিপের মরদেহ। আর এখন জেব ওয়াটারসের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে লাশ মারচেস্টারে পৌঁছে দেয়ার।

কাজটা মোটেও পছন্দ হয়নি জেবের। ভয় পাবার যদিও কিছু নেই, জানে সে, কিন্তু রেন থারপিয়ান হিলসের এই পর্বতের রাজ্যে এসে এখন নিজেকে তার খুব একা মনে হতে লাগল। জায়গাটা নিজের হাতের তালুর মতই চেনে জেব। তবুও এই সময় একজন সঙ্গী থাকলে খুব ভাল হত, ভাবছে সে। কফিনটার কথা মনে পড়লেই কেমন অস্বস্তি লাগছে তার।

বাতাসের গতি বেড়ে চলল, বৃদ্ধি পেল তুষারপাত। তবে ভ্যানের ক্যাবটা এখনও উষ্ণ। গাড়ির একটা উইন্ডশিল্ড ভাঙা, ফুটোয় কম্বল সেঁটেও কাজ হয়নি কোন, হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছেই।

পাহাড়ের মাথায় ঝুলে থাকা মেঘের মধ্যে থেকেই যেন ঝুপ করে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার, জেব আলো জ্বালল। ওর ভ্যানটা বহু পুরানো, হেডলাইট কাজ করে চুম্বক শক্তিতে। তুষারপাত দ্রুত ঘন হয়ে আসতে জেব বাধ্য হলো স্পীড কমাতে। হেডলাইটের আলো টিমটিমে হয়ে এল, কোনমতে আলোকিত থাকল সামনের রাস্তা।

এ রাস্তার যেন শেষ নেই। তুষার পুঞ্জ হয়ে জমতে শুরু করেছে। পাহাড়ের গা থেকে ঘূর্ণি পাকিয়ে বরফের সাদা পর্দা মিহি তুষার নিয়ে ভ্যানের ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। হু হু করে ঠাণ্ডা বেড়েই চলেছে।

রাস্তার সবচেয়ে খাড়া ঢাল, ক্রোমস হিল, অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল চোখের সামনে। জেব লক্কর ঝক্কর মোটরটার অ্যাকসেলেরেটর সজোরে দাবিয়ে ধরল পা দিয়ে। ধুঁকতে ধুঁকতে ওপরে উঠতে শুরু করল মান্ধাতা আমলের গাড়ি, পেছনের চাকা দুটো দ্রুত পাক খাচ্ছে বরফে, যেন পিছলে নেমে যাবে। এঞ্জিনটা তীব্র প্রতিবাদ জানাল। ট্রান্সমিশন গুঙিয়ে উঠল, যেন ভয়ানক ব্যথা পাচ্ছে। ধীরে, ধীরে, ঠেঙাতে ঠেঙাতে বহু কষ্টে ঢালের মাথায় উঠে এল ভ্যান।

'যাক বাবা, বাঁচা গেল'—চিৎকার করে বলল জেব। কিন্তু একটু বেশিই উল্লাস প্রকাশ করে ফেলেছে সে। কারণ হঠাৎই মোটরের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেল, নিভে গেল হেডলাইট। চারপাশে বাতাসের গর্জন আর পর্বতমালার ভৌতিক ধূসর অন্ধকার নিয়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকল গাড়িটা।

স্রেফ কাঠ হয়ে গেল জেব ওয়াটারস। ভয়ের চোটে কয়েক মুহূর্ত নড়তেই পারল না। একটা লাশ নিয়ে বরফের রাজ্যে বন্দি! সবচেয়ে কাছের শহর এখনও বিশ মাইল দূরে আর সে কিনা এই নিস্তব্ধ পরিবেশে একটা কফিনের সঙ্গে! ভয়ঙ্কর অবস্থাটা অনুধাবন করে কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ফুটল জেবের।

কিন্তু ব্যাপারটা কি ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে না? এত ভয় পাবার কী আছে? ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেই তো আর সমস্যা থাকে না। কাল সকালে মারচেস্টারবাসী যখন দেখবে সে লাশ নিয়ে পৌঁছেনি, তারা অবশ্যই খোঁজ

নিতে আসবে। সম্ভবত ইথান আসবে। বুড়ো ইথান। বুড়ো এসে নিশ্চয়ই তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে বলবে: 'এই যে জেব, তারপর একটা লাশের সঙ্গে রাত কাটাতে কেমন লাগল, বল দিকিনি?'

তারপর ওরা হাসিঠাট্টা করে যাত্রা শুরু করবে শহরের উদ্দেশে।

কিন্তু সে কাল সকালের কথা। এখন তো বাইরে ঝড় হচ্ছে—আর ওই লাশ।

গাড়ি থেকে নামল জেব, এঞ্জিন নাড়াচাড়া করল। জানে লাভ নেই। কারণ এ গাড়ি সহজে স্টার্ট হবার নয়।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল জেব, উঠে বসল ক্যাবে। কিন্তু পুরানো ক্যাব ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারছে না। এখানে ওখানের ফুটো দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঢুকছে, তুষারসহ। জেবের ঘাড়েও এসে জমল খানিকটা বরফ। হঠাৎ জেবের মনে পড়ল গাড়ির পেছনের অংশটা দিনকয়েক আগে মেরামত করেছে সে, ঝড়ো বাতাস ওটার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এখানে কয়েকটা দড়ির বান্ডিলও আছে। জিনিসপত্র যেন না ভাঙে সেইজন্য জেব ওগুলো রেখেছে। সবই ঠিক ছিল। ইস্, শুধু যদি কফিনটা ওখানে না থাকত! কফিনের পাশে শুয়ে কেউ ঘুমাতে পারে? চট করে বুদ্ধিটা খেলল জেবের মাথায়। কফিনটাকে ক্যাবের মধ্যে এনে রাখলেই হয়। তাহলেই ওখানে প্রচুর জায়গা হবে, জেব অনায়াসে পা ছড়িয়ে শুতে পারবে। দড়ির বান্ডিল জায়গাটাকে গরম রাখবে।

মনস্থির করে ফেলল জেব। কাজে লেগে গেল। তবে কাজটা কঠিন, সময়সাপেক্ষও বটে। কফিনটা বেশ ভারী, ক্যাবটা ছোট, ঠেলেঠুলে ঢোকাতে হলো। কাজ শেষে সন্তুষ্টচিত্তে ভ্যানের পেছনের অংশে ঢুকল জেব, বন্ধ করল দরজা, ঘুমাবার জন্যে দড়ির বান্ডিলের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু সহজে ঘুম এল না। ঝড়ের গর্জন কানে বাড়ি মারছে জেবের। হঠাৎ হঠাৎ গাড়িটা কেঁপে উঠল যেন প্রবল বাতাস ধাক্কা দিয়েছে। বৈদ্যুতিক তারের গোঙানির শব্দ শুনল জেব। মিহি বরফ স্তূপ হয়ে জমছে গাড়ির ছাদে। আর্তনাদ করে উঠল লোহার একজস্ট পাইপ, ঠাণ্ডা হয়ে এল ওটাও। বয়ে যেতে লাগল সময় অসহ্য মন্থর গতিতে।

হঠাৎ ঝট্ করে উঠে বসল জেব ওয়াটারস। ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না জানে না, কিন্তু এখন ওর চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই।

গাড়ি চলছে! বরফের গায়ে টায়ারের শব্দ স্পষ্ট শুনল জেব, অল্প অল্প দুলছে ভ্যান। উঠে দাঁড়াল জেব, ক্যাব আর ভ্যানের পেছনের অংশটাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে কাঠের একটা দেয়াল, দেয়ালটার ছোট জানালায় মুখ চেপে ধরল সে।

এক মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেল না জেব। জানালার সঙ্গে সেঁটে আছে মখমলের মত মসৃণ অন্ধকার। তারপর অন্ধকার চোখ সয়ে এল। ক্যাবের মধ্যে একটা কাঠামো ধীরে ধীরে আকৃতি পেল, স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা লোক ড্রাইভারের সীটে বসে আছে হুইল ধরে।

গাড়িটা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত চলছে। দুলছে আগের চেয়েও বেশি, চাকার শব্দ বিস্ফোরণের মত কানে বিঁধল। অদ্ভুত ব্যাপার, এঞ্জিনের কোন শব্দ নেই! জেব গ্লাসের গায়ে টোকা দিল।

'হেই!' চিৎকার করে বলল সে—'গাড়ি থামাও!'

কিন্তু লোকটা তার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। হুইলের ওপর তার হাত দুটো যেন আটকে আছে শক্তভাবে, কনুই দুটো দুপাশে ছড়ানো, কাঁধজোড়া ঈষৎ নিচু। সামনের অন্ধকার রাস্তা ছাড়া আর কিছুর প্রতি যেন তার নজর নেই। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল ভ্যানের গতি।

ছোট জানালায় দড়াম করে ঘুসি মারল জেব। চৌচির হয়ে গেল গ্লাস।

'আমার কথা কানে যায় না?'—গর্জে উঠল সে। 'গাড়ি থামাও! থামাও বলছি!'

এই সময় মাথা ঘোরাল লোকটা, তাকাল জেবের দিকে। আধা অন্ধকারেও তাকে চিনতে পারল জেব—পাণ্ডুর সাদা একটা মুখ, চকচকে কালো চোখ।

'ওহ্ খোদা,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'ফি—ফিলিপ কার!'

মৃগী রোগীর মত ফোঁপাতে শুরু করল জেব, ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেয়াল চেপে ধরল দুহাতে।

'ফিলিপ কার,' আর্তনাদ বেরিয়ে এল জেবের গলা চিরে। 'তুমি মরে গেছ। তুমি মরে গেছ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? মরামানুষ কিছুতেই গাড়ি চালাতে পারে না।'

ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটা ভয়ঙ্কর গলায় খল খল করে হেসে উঠল। ঝুঁকে পড়ল হুইলের ওপর, যেন আরও জোরে গাড়ি ছোটাবে। ভ্যানটাও যেন জাদুর স্পর্শে লাফিয়ে উঠল। উন্মাদের মত ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠল। ওটা অভিশপ্ত প্রাণীর মত প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে। বিশাল সাদা মেঘের আকৃতি নিয়ে রাশি রাশি বরফ বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাচ্ছে গাড়িটার পাশ দিয়ে। বাতাসের গর্জন তো নয় যেন নেকড়ের ডাক!

হঠাৎ সাঁৎ করে বাঁ দিকের রাস্তায় মোড় নিল গাড়ি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে সোজা এগোল অন্ধকার একটা খাদের দিকে। খাদের ঠিক মুখে একটা বিশাল গাছ, ঝড়ে ওটার ডালপালা প্রবল বিক্ষোভে আন্দোলিত হচ্ছে।

তারপরই প্রবল একটা সংঘর্ষের শব্দ!

'ব্যাপারটা অদ্ভুত'—ভুরু কুঁচকে বললেন ডাক্তার।

বুড়ো ইথান থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বলল: 'অবস্থা দেখে মনে হয় জেবের গাড়িটা পাহাড়ের ঢালে উঠে নষ্ট হয়ে যায়। ওটাকে আর চালাবার উপায় নেই জেনে জেব নিশ্চয়ই ক্যাব ছেড়ে ভ্যানের পেছনের অংশে গিয়ে বসেছিল শরীর গরম রাখতে। আর রাতের বেলা প্রবল ঝড়ো হাওয়া গাড়িটাকে ঠেলে এই খাদের কাছে নিয়ে আসে এবং গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ওটা ভেঙে তুবড়ে যায়। আর বেচারা জেব তখনই মারা যায়। আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা, ইথান।' জবাব দিলেন ডাক্তার। 'কিন্তু অবাক ব্যাপার জেবের শরীরে আঘাতের কোন চিহ্নই নেই। মনে হচ্ছে হার্টফেল করে মারা গেছে। আর ফিলিপ কারের লাশটা দেখুন···সংঘর্ষের ফলে কাফনটা সম্ভবত ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু রিগর মর্টিসের প্রভাবে সে ওভাবে বসে থাকবে এটাও ঠিক হিসেবে মিলছে না। ওর হাত দুটো লক্ষ করুন। মনে হচ্ছে না সে-ই আসলে গাড়িটা চালাচ্ছিল?'

নিশীথ তৃষ্ণা

সেপ্টেম্বরের বিশ্রী এক সন্ধ্যা। ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই। থামার কোন লক্ষণ নেই। একা বাসায় বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। তাই এমন আবহাওয়াতেও বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম হারবার স্ট্রীটে। মূল রাস্তা থেকে একটি অপরিসর, সরু গলিতে ঢুকে কিছুদূর এগোবার পরেই দোকানটির সাইনবোর্ড চোখে পড়ল: গিয়োভান্নি লারলা--অ্যান্টিকস। দোকানটির কালো, নোংরা খোলা জানালা দিয়ে ম্লান আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাইরে।

দোকানটির সামনে থমকে দাঁড়ালাম আমি। অ্যান্টিকসের প্রতি আমার আগ্রহ বরাবরই প্রবল। সুযোগ পেলেই বিভিন্ন প্রাচীন জিনিসপত্র সংগ্রহ করি। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। আধা আলো, আধা অন্ধকারে গাদা করা কতগুলো বাক্স, একটি বিশাল আবক্ষমূর্তি চোখে পড়ল। কোনার দিকে একটি ওয়াইন কেবিনেট দেখতে পেলাম, ইতালীর রেনেসাঁ আমলের, নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে। ওটার পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হলো যেন আমাকে ভ্রূকুটি করল।

'শুভ সন্ধ্যা, সিনর। কিছু কিনবেন? ছবি, আংটি কিংবা ফুলদানী?'

আমি বেঁটে, মোটা ইতালীয় দোকানদারের দিকে তাকালাম। মাথা নেড়ে বললাম, 'নাহ্, কিছু কিনতে আসিনি। একটু ঘুরে দেখব।'

লোকটার তেলতেলে মুখে কোন অভিব্যক্তি ফুটল না। এরকম জবাব শুনে সে অভ্যস্ত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে একটা শেলফের দিকে এগিয়ে গেল। সুদৃশ্য একটি পানপাত্র বের করল ভেতর থেকে।

'এটা ষোড়শ শতাব্দীর মাল, সিনর,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কেনার মত জিনিস বটে।'

আবারও মাথা নাড়লাম আমি। 'কোনও অ্যান্টিকস নয়,' বললাম ওকে। 'বই-টই থাকলে দেখাও।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আমার কাছে বইপত্রও আছে। দুষ্প্রাপ্য সব বই যা আপনি এই গিয়োভান্নি লারলা ছাড়া অন্য কারও কাছে পাবেন না। তবে তার আগে আমার অন্য সংগ্রহগুলোও একবার দয়া করে দেখুন।'

দোকানি লারলা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমাকে এরপর তার 'মূল্যবান সম্পদ'গুলো দেখাতে লাগল। মুক্তাখচিত সেফটিপিন, কয়েকশো বছরের পুরানো বাঁকানো কেদারা, হলুদ কাদা দিয়ে তৈরি মূর্তি, জীর্ণ পোর্টল্যান্ড ফুলদানী ইত্যাদি আরও অনেক কিছু দেখলাম প্রায় একঘণ্টা ধরে। বেশ কয়েকবার ঘড়ির দিকে তাকালাম, অবাক হয়ে ভাবলাম এখনও এই রদ্দিমার্কা দোকান ছেড়ে চলে যাচ্ছি না কেন। ছমছমে অন্ধকার আর গতানুগতিক এই অ্যান্টিকসের প্রতি আর আকর্ষণ অনুভব করছি না। ব্যস্ত হয়ে উঠলাম চলে যাওয়ার জন্য।

কিন্তু এইসময় লারলা আমাকে তার দোকান ঘরের পেছন দিকে নিয়ে যেতেই

একটা জিনিস নজর কেড়ে নিল আমার। একটা শেলফ। বই বোঝাই। প্রথম বইটি শেলফ থেকে নিয়ে নজর বোলাতেই বুঝলাম এটা একটা পিশাচ কাহিনী। যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম এই বইটি আমার জন্য অচিরেই নিয়ে আসছে দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতা, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে সভয়ে কুষ্ঠরোগীদের মতই বর্জন করতাম আমি। কিন্তু হরর গল্পের প্রতি আমার আকর্ষণ সীমাহীন। তাছাড়া বইটির কালো মখমলে মোড়া প্রচ্ছদও আমাকে আকৃষ্ট করল দারুণভাবে। যদিও এটার মধ্যে কি আছে জানি না কিন্তু উল্টেপাল্টে দেখে মনে হলো বইটি গতানুগতিক বটতলার উপন্যাসের থেকে আলাদাই হবে।

'কার বই এটা?' জানতে চাইলাম আমি।

লারলা মুখ তুলে চাইল। ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল, 'এটা বিক্রির জন্য নয়। কিভাবে এটা শেলফে এল বুঝতে পারছি না।'

বইটি ওজনে বেশ ভারী। এত শক্ত বাঁধাই জীবনে দেখিনি। প্রচ্ছদের মাঝখানে রূপোর একটা নরমুণ্ডু আঁকা। বইটির টাইটেল আমার নজর কাড়ল। সোনার জলে লেখা: 'পাঁচটি একশিঙা ঘোড়া এবং একটি মুক্তা'। লারলার দিকে তাকালাম আমি। পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'দাম কত?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লারলা। 'দুঃখিত, এটা বিক্রি করব না। এটা…এটা আমার ভাইয়ের লেখা বই। পাগলা গারদে মারা যাওয়ার আগে সে বইটা লিখেছিল।'

'পাগলা গারদ?'

লারলা কোন জবাব দিল না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বইটির দিকে। যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ সময় অতিবাহিত হলো। তারপর যখন কথা বলতে শুরু করল সে, ঝিকিয়ে উঠল চোখ। আমার মনে হলো উত্তেজনায় ওর আঙুলগুলো কাঁপছে।

'আমার ভাই, আলেসান্দ্রো, এই বইটা লেখার আগে সুস্থ, সবল একজন মানুষ ছিল, সিনর।' আস্তে আস্তে কথা বলল লারলা। 'সে লিখতও চমৎকার। আমাকে ওর লেখা কবিতা পড়ে শোনাত। স্বপ্ন দেখতে ভালবাসত আলেসান্দ্রো। সকল সুন্দরের প্রতি ওর ছিল তীব্র আকর্ষণ। চমৎকার কেটে যাচ্ছিল দু'ভাইয়ের দিন।

'কিন্তু…তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাতটা এল, তারপর থেকে সে…না থাক। তারপর এক বছর পার হয়ে গেছে। এখন ওসব মনে না করাই ভাল।' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল লারলা, সজোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইলাম আমি।

'হয়েছিল, সিনর? সত্যি আমি জানি না কি হয়েছিল। পুরো ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে গোলমেলে। হঠাৎ ও অসুস্থ হয়ে পড়ে, কোন কারণ ছাড়াই। সুদর্শন, সর্বদা হাসিখুশি আমার ভাইয়ের সুন্দর চেহারাটা দিন দিন মলিন হতে শুরু করল, মুখ থেকে মুছে গেল হাসি, দ্রুত নিঃশেষ হতে লাগল শক্তি। কত ডাক্তার দেখালাম, চিকিৎসা করালাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, বরং আরও দুর্বল হয়ে পড়ল সে। তারপর…'

*

হাত দুটো শরীরের দু'পাশে ছড়িয়ে দিল লারলা, ছটফট করে উঠল, ওর চোখ ভরে উঠল অশ্রুতে।

'তারপর··· ওহ্, সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো কি ভোলা যায়! বেচারী আলেসান্দ্রো বাড়ি ফিরত চিৎকার করতে করতে, কাঁদত। ও একদম পাগল হয়ে গিয়েছিল।

'প্রতিবেশীরা আলেসান্দ্রোকে পাগলা গারদে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা বললেন ওর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, কারণ ও নাকি কি একটা ব্যাপারে মানসিকভাবে ভীষণ আঘাত পেয়েছে। পাগলা গারদে ভর্তি করার সপ্তাহ তিনেক পর মারা যায় আলেসান্দ্রো মুখে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি নিয়ে।'

কিছুক্ষণ আমি কোন কথা বললাম না। চুপচাপ বাইরের বৃষ্টি দেখতে থাকলাম। তারপর বললাম, 'তোমার ভাই এই বইটি পাগলা গারদে থাকার সময় লিখেছে?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লারলা।

'তিনটে বই,' বলল সে। 'আপনার হাতেরটার মতই আরও দুটো লিখেছিল। বাইন্ডিং ওর নিজের হাতে করা। বই বাঁধাই করা ছিল ওর শখ। কাজটা করতও খুব চমৎকার। কিন্তু আমি ওর লেখা এই বইগুলোর একটাও পড়িনি। পড়তে চাইওনি। এগুলো আমার কাছে আছে শুধু তার স্মৃতি হিসেবে। কিন্তু এই শেলফে বইটা রেখেছি বোধহয় ভুলে। আমি বইটাকে ওর অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে আলাদাভাবে রেখে দেব।'

বইটি পাব না জেনে এটার প্রতি আমার আকর্ষণ হাজার গুণ বেড়ে গেল। মনোবিজ্ঞানের অস্বাভাবিক দিক সম্পর্কে আমার কৌতূহল অপরিসীম, এসবের ওপর প্রচুর বইও আছে আমার সংগ্রহে। আর এই বইটি কিনা লিখেছে পাগলা গারদের এক মানসিক রোগী। আমি নিশ্চিত বইটি মানসিক প্রতিবন্ধীদের অচেনা জগৎ-এর দ্বার উন্মোচন করে দেবে। এটা হস্তগত করার ইচ্ছে আমার তীব্র হয়ে উঠল যেভাবে হোক এই বই আমার চাই-ই চাই।

লারলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। খুব সাবধানে বাছাই করা কথাগুলো বলতে শুরু করলাম: 'বইটি তুমি স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছ। আমি তোমার এই মানসিকতার খুব প্রশংসা করি,' বললাম আমি। 'বইটি যখন তুমি বিক্রি করবেই না, একদিনের জন্য ধার দেবে? পড়ে কালকেই ফেরত দেব!' ইতস্তত করল লারলা। 'না, না আমি দুঃখিত···'

'ভাড়া বাবদ তোমাকে দশ ডলার দেব।'

লারলা তার জুতোর দিকে চেয়ে বলল, 'ঠিক আছে, সিনর। আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু প্লীজ, কাল কিন্তু অবশ্যই বইটি ফেরত আনবেন।'

সেদিন রাতে, নির্জন বাসায় বইটি নিয়ে বসলাম আমি। পৃষ্ঠা ওল্টাতেই চোখে পড়ল মেয়েলী হাতের কিছু হিজিবিজি লেখা। লাল রঙের। যেন রক্ত। আমি পড়লাম *'বাইবেলের শেষ পুস্তক "উদঘাটিত রহস্যসমূহ" মানে কোন কিছুর ধ্বংস সাধন, কিন্তু শুধু খুঁটি ছাড়া বন্ধন। পড়ো, বোকা এবং আমার ভুবনে প্রবেশ করো, কারণ আমরা একই সুতোয় গাঁথা। অভিশাপ নেমে আসুক লারলার ওপর।'*

অনেক চেষ্টা করেও কথাগুলোর কোন মর্ম উদ্ধার করতে পারলাম না আমি।

শেষমেষ ও চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বইটির প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়তে শুরু করলাম। আলেসান্দ্রো লারলার শেষ লেখা আমার সামনে উন্মোচিত করল অজানা, রহস্যময় এক জগৎ।

'পনেরোই অক্টোবরের সন্ধ্যা। বেরিয়ে পড়েছিলাম আমি ঠাণ্ডার মধ্যে। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত হাঁটতেই থাকলাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ব্লুজে পাখিদের পরিত্যক্ত আস্তানায়। ছাব্বিশটা পাখি আছে ওখানে এক কাতারে। ওখানে, মরা গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে চৌবাচ্চার ধারে উজ্জ্বল চোখের একটি মাছকে দেখতে থাকলাম অলস দৃষ্টিতে। দেখলাম একটা বাচ্চা প্রার্থনা করছে। কাঁচ ভেদ করে চাঁদের আলো আমার গায়ে খেলা করতে লাগল। ঘাসেরা আমার পায়ের নিচে গাইতে লাগল প্রার্থনা সংগীত। আর লম্বা এবং তীক্ষ্ণ একটা ছায়া ধীরে ধীরে আমার বাঁ দিকে সরে এল।

আমি রূপালি নুড়ি বেছানো পথ ধরে হাঁটতেই থাকলাম। এক সময় এসে হাজির হলাম জলের ধারে, পাঁচটি একশিঙা ঘোড়ার কাছে, লাফানোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সবক'টা। এই সময় আমার মুক্তোটিকে চোখে পড়ল। অসম্ভব সুন্দর একটি মুক্তো। কিন্তু কালো রঙের। ফুলের সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল ওটা, একবার ভাবলাম গন্ধটা আসলে ভুয়া, কিন্তু এত দৃষ্টিনন্দন একটি জিনিস কি ছলনা করতে পারে?

আমি মাছ আর ঘোড়াগুলোর পাশে বসলাম আর তক্ষুণি তীব্র ভালবাসা জেগে উঠল মুক্তোটির জন্য। অতীতকে মনে হলো নীরস আর—'

বইটি সরিয়ে রাখলাম এক পাশে। পাইপ থেকে নির্গত ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম আলেসান্দ্রোর এসব লেখার মানে কি? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। গোটা ব্যাপারটাই অস্পষ্ট আর ধোঁয়াসা। অন্য কেউ হলে এসব লেখা অর্থহীন, পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিত। কিন্তু আমার সেরকম কিছু ভাবতে ইচ্ছে করল না, বরং মনে হলো এর মধ্যে গূঢ় কোন রহস্য নিহিত।

দুর্বোধ্য কথাগুলোর মর্ম উদ্ধার করার ব্যর্থ চেষ্টায় আমার কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। ঘরের বাতাস তামাকের ধোঁয়ায় ভারী। আমি জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম, পর্দাটা একপাশে টেনে সরালাম, ওখানে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ধূমপান করলাম কিছুক্ষণ। হঠাৎ কেন জানি ইচ্ছে করল যাই, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। বাইরের অন্ধকার রাস্তা আমাকে প্রবলভাবে টানতে লাগল।

আমি অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এক সময় আর থাকতে পারলাম না, পাইপটা টেবিলে রেখে হ্যাট আর কোটটা নিয়ে দরজা খুলে পা বাড়ালাম বাইরে।

রাস্তায় বেরিয়েই কেন জানি উত্তর দিক লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করলাম। এদিকটা আমি ভাল চিনি না। কিন্তু তারপরও কেন যে এদিক পানেই হাঁটছি নিজেই জানি না। আজকের আবহাওয়া খুব সুন্দর। চাঁদ চমৎকার আলো ছড়াচ্ছে। বাতাসে শীতের আগমনের গন্ধ। ক্যাপিটল টাওয়ারের ঘণ্টাগুলো একবার মধ্যরাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে বেজে উঠল, তারপর আবার গাঢ় নীরবতার মধ্যে ডুবে গেল গোটা শহর।

হাঁটার সময় বারবার আমার মাথায় আলেসান্দ্রো লারলার বইয়ের 'পাঁচটি

একশিঙা ঘোড়া এবং একটি মুক্তো' কথাটি আঘাত করতে লাগল। মানে কি এর?

হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারলাম নিজের ইচ্ছেয় যতটা না আসলে অন্য কোন শক্তি আমাকে প্রভাবিত করছে এগিয়ে যেতে। কারণ একবার থেমে দাঁড়িয়েও পরক্ষণে আবার কি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে চলতে শুরু করেছি আমি।

ইস্টারলি স্ট্রীটের শেষ মাথায় পৌঁছে গেলাম আমি একসময়, থমকে দাঁড়ালাম ফুটপাথ ঘেঁষা এক পাথুরে দেয়ালের সামনে। দেয়ালটার ওপাশে একটা অন্ধকার বাড়ির আকৃতি চোখে পড়ল। খোলা কারুকার্য করা লোহার গেটের অদূরে একটি উঠন মত জায়গা। জায়গাটিতে কয়েকটি ঝর্ণা, লোহার বেঞ্চ, পাথরের মূর্তি, ঝোপঝাড় আর গুল্ম ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় নজরে এল। বাড়িটির জানালাগুলো খোলা, মাথায় একটা গম্বুজ। জানালার কাঁচে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে বড় বড় ছায়া ফেলেছে মাটিতে।

লোহার গেটের সামনে আসতেই আমার শরীর যেন জমে গেল। টের পেলাম আমাকে যে আধিভৌতিক শক্তিটি এখানে টেনে এনেছে ওটা এখন যেন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। মনে হলো, শক্তিটি যেন একটা আকৃতি পেতে যাচ্ছে, জোর করে আমাকে টানতে শুরু করল গেটের ওপাশে খোলা চত্বরের দিকে। প্রবল বিতৃষ্ণায় কেঁপে উঠলাম আমি।

যেন সম্মোহন করা হয়েছে, এইভাবে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমি, ঘাস বিছানো পথ ধরে এগিয়ে চললাম সামনে। জায়গাটার পরিবেশকে আমার মনে হলো অপার্থিব, মৃত, বাইরের সমস্ত কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু পায়ে মাড়ানো শুকনো পাতার খচমচ শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই কোথাও। অন্ধকার বাড়ি, জানালা আর গম্বুজটাকে আমার হঠাৎ মনে হলো বিশালদেহী একটি শিকারী কুকুর, হামাগুড়ি দিয়ে আছে, লাফিয়ে পড়বে যে কোন সময়। বাগানে অনেকগুলো ঝর্ণা, কালের আঘাতে জীর্ণ। পাথুরে ঝর্ণাগুলোর সঙ্গে অদ্ভুত কিছু মূর্তি। আমি মাত্র একবার ওগুলোর দিকে তাকালাম। কিন্তু আমার নজর কাড়ল একটি ঝোপের আড়ালে অর্ধেক লুকানো একটি বাচ্চার প্রস্তর মূর্তি। মূর্তিটি প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছে। বাতাসের ক্রমাগত ঘর্ষণ ওটার মুখের পাথরগুলোকে ক্ষয়ে ফেলেছে, ফলে আধা আলোতে পুরো আকৃতিটাকে ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস মনে হলো।

কতক্ষণ ওখানে ছিলাম বলতে পারব না, কিন্তু মনে হচ্ছিল উঠতে চাইলেও উঠতে পারব না। চাঁদের আলোতে পারিপার্শ্বিক সবকিছুকে আমার অদ্ভুত এবং অপার্থিব মনে হতে লাগল। যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। হঠাৎই যেন বিদ্যুতের চাবুক খেলাম শরীরে চারপাশে ভালভাবে চোখ বুলাতে গিয়ে। আশপাশের জিনিসগুলো যেন পূর্ণ রূপে ধরা দিল আমার কাছে, স্থির, নিস্পন্দ দেহে বিস্ফারিত চোখে আমি ওগুলোকে দেখলাম। সন্দেহ হলো স্বপ্ন দেখছি কিনা। এই জিনিসগুলো…এ হতে পারে না—

প্রথমেই ঝর্ণাটার ওপর আমার চোখ আটকে গেল। জলের ওপরে পাঁচটি একশিঙে ঘোড়া, এমনভাবে তৈরি যেন সবগুলো লাফানোর জন্য প্রস্তুত। চোখ চলে গেল আরও দূরে, বাড়িটির মাথায় গম্বুজে, চাঁদের আলো পড়েছে ওটার ওপরে, আর

লম্বা এবং তীক্ষ্ণ একটি ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে আমার বাঁ পাশে। খানিকটা দূরে একটা পাথুরে মাছ নজরে এল আমার, ওটার কোটরহীন চক্ষু যেন ঝকমক করে উঠল। আর সবশেষে দেয়ালটা! দেয়ালটির প্রতি তিন ফিট অন্তর জায়গা যেন ফুলে আছে, আকৃতি পেয়েছে কতগুলো পাথুরে পাখির। গুনলাম পাখিগুলোকে। ছাব্বিশটা ব্লুজে।

হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম আমি ওখানেই। লারলার বইয়ে বর্ণিত গোটা দৃশ্যের এমন বাস্তব রূপ দেখব কল্পনাও করিনি। বিস্ময়ের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারিনি তখনও, এই সময় একটা পারফিউমের হালকা গন্ধ ভেসে এল নাকে, গন্ধটা সুন্দর। বুক ভরে দম নিলাম। হঠাৎ গন্ধটা বেড়ে চলল, এত তীব্র হয়ে উঠল যে শ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হতে লাগল। সূর্যমুখী ফুলের গন্ধ! মধুগন্ধী সৌরভটা ছড়িয়ে পড়ল বাগানে, ভারী করে তুলল বাতাস।

এই সময় আমি বিস্ময়ের দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেলাম। গন্ধটা কোত্থেকে আসছে সূত্র খুঁজতে ঘাড় ঘোরাতেই বিপরীত দিকের বেঞ্চিতে বসা মহিলাকে চোখে পড়ল আমার। কালো কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢাকা মহিলার, মুখে ঘোমটার অবগুণ্ঠন। আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে বলে মনে হলো না। তার মাথা ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে।

একই সঙ্গে তার পাশে হামাগুড়ি মেরে বসে থাকা 'জিনিস'টাকেও দেখতে পেলাম আমি। একটা কুকুর, বিশালদেহী, প্রকাণ্ড মাথা, চোখ দুটো টেনিস বলের মত বড়। অনেকক্ষণ একঠায় ওদের দিকে চেয়ে রইলাম আমি। বাতাস ঠাণ্ডা, কিন্তু মহিলার গায়ে কোন গরম পোশাক নেই।

একা সময় কাটানোর ভাগ্য আর কপালে নেই ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার উপস্থিতি সম্পর্কে এবারও উদাসীন রইল সে। শেষ পর্যন্ত আমিই গলাখাঁকারি দিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলাম, 'আপনি বোধহয় এই বাড়ির মালিক। আমি…আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এখানে কেউ থাকেন। আর গেটটা…ওটা খোলা ছিল। এভাবে না বলে অনুপ্রবেশের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

মহিলা কোন কথা বলল না, কুকুরটা নীরবে আমার দিকে চেয়ে থাকল। অস্বস্তি লাগতে লাগল আমার, আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে পা বাড়ালাম গেটের দিকে।

'প্লীজ, যাবেন না,' হঠাৎ কথা বলে উঠল মহিলা, মুখ তুলে তাকিয়েছে, 'আমি খুব একা। বড় একা আমি।' বেঞ্চির একপাশে সরে বসল সে, আমাকে ইশারা করল বসতে। কুকুরটা একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েই আছে।

সূর্যমুখী ফুলের গন্ধ নাকি চাঁদের মায়াবী আলোর আকর্ষণে ঠিক বলতে পারব না, আমার খুব ইচ্ছে করল মহিলার পাশে বসে খানিকক্ষণ গল্প করি। ওর পাশে এসে বসলাম আমি।

কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতার মধ্যে, কথা বলতে শুরু করব কিনা বুঝে উঠতে পারছিলাম না, হঠাৎ মহিলা ঘুরে বসল কুকুরটার দিকে। জার্মান ভাষায় বলল—

'ফোর্ট মিট ডির, জোহান!'

অনুগত ভৃত্যের মত উঠে দাঁড়াল বিশালদেহী জানোয়ারটা, আস্তে করে মিশে

গেল অন্ধকারে। বাড়িটার দিকে ওটাকে চলে যেতে দেখলাম আমি। মহিলা এই সময় কথা বলতে শুরু করল ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে, 'বহুদিন পরে আমি কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম···আমরা এখানে নতুন এসেছি। আমি আপনাকে চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। তবুও···চেনা পরিচয়হীন মানুষগুলোর মধ্যে কখনও কখনও সখ্যতা গড়ে ওঠে। আচ্ছা···আমরা কি পরস্পরের পরিচিত হতে পারি না?'

'কেন পারব না?' বললাম আমি। 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভালই লাগছে। তা আপনি থাকেন কোথায়—এখানেই?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মহিলা, ওর ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলেছি কি? শঙ্কিত হয়ে ভাবলাম আমি। তারপর সে মৃদু গলায় তার পরিচয় দিল, 'আমার নাম পার্ল ভন মরেন। আমি আপনাদের দেশে একেবারেই নতুন। যদিও এখানে থাকছি এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল। আমার বাড়ি অস্ট্রিয়ায়, চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তে। আমার ভাইকে খুঁজতে আমেরিকায় এসেছি আমি। গত যুদ্ধের সময় সে জেনারেল ম্যাকেনসেনের অধীনে লেফটেন্যান্ট পদে কাজ করেছে। কিন্তু ১৯১৬-র এপ্রিলে, আমি খবর পেলাম···ওর আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

'যুদ্ধ খুব বাজে একটা ব্যাপার। যুদ্ধে আমরা সব হারিয়েছি। আমাদের টাকা, ডানিউবের বিশাল বাড়ি, তারপর আমার একমাত্র ভাইকেও হারালাম। কি ভয়ঙ্কর ছিল সেইসব দিন। কিন্তু তারপরও আমি আশা ছাড়িনি। মন বলছিল ও এখনও বেঁচে আছে। তারপব একদিন যুদ্ধ থেমে গেল। আমার ভাইয়ের এক অফিসার বন্ধু বলল তাকে নাকি সে মনপ্রে-র কাছে এক ফরাসী কারাগারে দেখেছে। তারপর শুনলাম ওকে আমেরিকায় দেখা গেছে। আমি আর অপেক্ষায় থাকিনি। যা পেরেছি টাকাপয়সা জোগাড় করে আপনাদের এখানে চলে এসেছি।'

আস্তে আস্তে গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে এল মহিলার। নীরবে তাকিয়ে থাকল ধূসর ঘাসের দিকে। যখন আবার কথা বলতে শুরু করল, গলা কাঁপতে লাগল তার। 'আমি···অবশেষে ওর খোঁজ পেয়েছি··· কিন্তু না পেলেই বরং ভাল হত। ও···ও আর নেই।'

আমি মহিলার দিকে তাকালাম। 'মারা গেছে?' জানতে চাইলাম।

ঘোমটার আড়ালে কেঁপে উঠল মহিলার শরীর। যেন অতীতের ভয়ঙ্কর কোন কথা মনে পড়ে গেছে। আমার প্রশ্ন যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে বলে চলল:

'আজ রাতে আমি এখানে এসেছিল্যাম—জানি না কেন—হয়তো গেটটা খোলা ছিল, আর জায়গাটাও খুব নিঝুম মনে হচ্ছিল। আমি বোধহয় আমার ব্যক্তিগত কথা বলে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করেছি, তাই না?'

'না না' বলে উঠলাম আমি। 'আমি কোন কারণ ছাড়াই এখানে এসেছিলাম। সম্ভবত জায়গাটার নিসর্গ আমাকে খুব আকর্ষণ করছিল। ছবি তোলার ব্যাপারেও আমার খুব আগ্রহ আছে। গতানুগতিকতার বাইরে ছবি তোলার সুযোগ খুঁজে বেড়াই সবসময়। একটা বই পড়ছিলাম। মনটা খুব ভার হয়ে ছিল। তাই ভাবলাম বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'বই,' হঠাৎ অস্বাভাবিক এক মন্তব্য করে বসল মহিলা, 'খুব শক্তিশালী জিনিস। কারাগারের শৃঙ্খলের চেয়েও এই জিনিস কঠিন বেড়ি পরাতে পারে যে কাউকে।'

তার কথায় আমার বিস্মিত ভাবটুকু ধরে ফেলল সে। ইতস্তত গলায় বলল, 'আসলে এমন অদ্ভুত একটা জায়গায় আমাদের পরিচয় হয়েছে…'

আমি কোন কথা বললাম না। তার সূর্যমুখী ফুলের গন্ধওলা পারফিউমের কথা ভাবছিলাম। এই মহিলাকে এই সুগন্ধীতে ঠিক যেন মানাচ্ছিল না। কেন জানি মনে হচ্ছিল এর মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। পারফিউমের গন্ধ যদি মিলিয়ে যায় তাহলে হয়তো আমি দেখব… কি দেখব?

সময় বয়ে যেতে লাগল দ্রুত। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় মেতে উঠলাম। টের পেলাম মহিলার সান্নিধ্য ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার। মহিলা একবারের জন্যেও তার ঘোমটা তোলেনি, অথচ আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল মুখখানা দেখতে। কিন্তু ঘোমটা তোলার কথা বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। এক অদ্ভুত অস্থিরতা আমাকে ক্রমশ গ্রাস করে চলছিল। মহিলা খুব সুন্দর কথা বলে, কিন্তু তার মধ্যে বর্ণনার দুঃসাধ্য এমন একটা কিছু আছে যা আমার অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলছিল।

কথা বলতে বলতে রাত পার হয়ে গেল, ভোরের প্রথম আলো ফুটি-ফুটি করছে এই সময় ঘটনাটা ঘটল। আমি পেছন ফিরে তাকিয়েছি কি কারণে, হঠাৎ পাতলা একটা ছায়া চোখে পড়ল, যেন বাগান থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। পরিত্যক্ত বাড়িটির দিকে তাকাতেই মনে হলো যেন কালো একটুকরো মেঘ দেখতে পেলাম আকাশে ভাসতে, মেঘের টুকরোটার দুই পাশে দানবাকৃতির বাদুরের মত ডানা!

জোরে একবার চোখে ডলা দিয়ে আবারও ওদিকে তাকালাম আমি।

'মেঘ!…আপনি দেখেছেন—'

থেমে গেলাম হঠাৎ করেই, চোখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস। বেঞ্চ খালি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে পাশের মহিলা।

পরদিন আমি ল অফিসে আমার পেশাদারী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু তেমন মনোযোগ দিতে পারলাম না। আমার পার্টনার বহুবার আমার দিকে অবাক চোখে তাকাল মাঝে মাঝেই বিড়বিড় করে কি যেন বলছি দেখে। আসলে গত সন্ধ্যার ঘটনাটি আমার মনকে তখনও প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে ছিল। অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওগুলো হাতুড়ির বাড়ি মারছিল মাথায়।

সন্ধ্যাবেলায় লারলার দোকানে হানা দিলাম আবার। বললাম সে যেন অনুগ্রহ করে তার ভাইয়ের লেখা বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডটিও আমাকে পড়তে দেয়। কিন্তু প্রথম খণ্ড ফেরত আনিনি বলে লারলা দ্বিতীয় খণ্ড দিতে রাজি হলো না। আমি ওকে অনেক অনুরোধ করে, ডাবল ভাড়ার লোভ দেখিয়ে অবশেষে হস্তগত করলাম আলেসান্দ্রোর লিখিত দ্বিতীয় খণ্ডটি।

বাসায় ফিরে আর দেরি না করে বইটি নিয়ে বসলাম। আলেসান্দ্রো আবারও একবার ওখানে গিয়েছিল দেখা যাচ্ছে! তবে এক জায়গায় আমার চোখ আটকে গেল। ওখানে লেখা:

'এও কি সম্ভব? প্রার্থনা করছি এ যেন সম্ভব না হয়। কিন্তু আমি যেন এখনও ওটাকে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি গর্জন। ওহ্ কি ভয়ানক কুৎসিত জীবটা! বিশ্বাস করব না, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।'

পড়া বন্ধ করে বইটি রেখে দিলাম। বলাবাহুল্য, আলেসান্দ্রোর এই লেখারও সারমর্ম কিছু উদ্ধার করতে পারিনি আমি। মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানোর জন্য আমার নতুন কেনা পোর্টেবল ক্যামেরাটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। হঠাৎ টের পেলাম ওই বাগানে যাওয়ার জন্য ভীষণ মন চাইছে। মহিলা আজকেও ওখানে আদৌ থাকবে কিনা সে বিষয়ে আমার নিজেরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তারপরও ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা চাগিয়ে উঠল। অনেকক্ষণ মনের সঙ্গে যুদ্ধ হলো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হলো ওই মহিলাকে নিয়ে চমৎকার একটি ছবি তোলা যাবে। ঘোমটা পরা এক মহিলা, কালো পোশাক পরনে, পাথুরে বেঞ্চিতে বসা. পেছনে প্রাচীন এক বাগানের পটভূমি···বাহ্ ছবি তোলার জন্য চমৎকার এক দৃশ্য যদি দৃশ্যটা একবার ক্যামেরাবন্দী করা যায়··· তাহলে ওটা পরের মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল ক্যামেরা কনটেস্টে পাঠিয়ে দেয়া যাবে। আর চাই কি প্রথম পুরস্কারটি আমার কপালেও জুটে যেতে পারে।

ব্যস, আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকল না মনে। ক্যামেরা এবং আনুষঙ্গিক সব জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমার কর্তব্য সাধন করতে।

আজ আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পেভমেন্টে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে বৃষ্টির, রাস্তায় একটি লোকও নেই। দক্ষিণ দিক থেকে জোর বাতাস বইছে। পুবের আকাশ ঢেকে আছে ভারী মেঘে, চাঁদকে আড়াল থেকে বেরুতে দিচ্ছে না। আমি কোটের কলার গলা পর্যন্ত টেনে দিলাম, হন হন করে এগিয়ে চললাম ইস্টারলি স্ট্রীটের দিকে ভূতুড়ে বাড়িটির সামনে এসে দেখলাম গেটটা আজকেও খোলা। বাগানটা যেন বৃষ্টির চাদর গায়ে দিয়েছে।

মহিলাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। হয়তো আজ আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে সে। একখানা ছবির মত ছবি হবে ভেবে উল্লসিত আমি ক্যামেরাটিকে পাথুরে ঝর্ণার ওপর সেট করে রাখলাম। লেন্সটাকে ঘুরিয়ে দিলাম আমাদের সেই বেঞ্চির দিকে যেখানে গতকাল বসেছিলাম। ফ্ল্যাশটা হাতের কাছেই প্রস্তুত থাকল।

সব গোছগাছ করার পর পেছনে নুড়ির রাস্তায় পায়ের শব্দ হতেই সাঁৎ করে ঘুরলাম আমি। এসেছে সে, সোজা গিয়ে বসল বেঞ্চিতে। ওর গায়ে গতকালকের মতই কালো পোশাক, মুখ ঢাকা ঘোমটায়।

'আপনি আজকেও আবার এলেন,' আমি তার পাশে বসার সময় মন্তব্য করল মহিলা।

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'বাড়িতে একা থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই ··'

আমাদের গল্প ক্রমে তার মৃত ভাইকে কেন্দ্র করে মোড় নিল। যদিও বারবার মনে হলো মহিলা আসলে ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। জানলাম মহিলার ভাই পরিবারের একটা বোঝা হয়ে উঠেছিল। ভীষণ উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করত সে। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয় পড়াশোনায়

অমনোযোগিতার কারণে। তারপর সে যুদ্ধে যোগ দেয়। যুদ্ধের ক্যাম্পে তার কাজ ছিল কবর খোদাই করা। মহিলা তার ভাইয়ের কবর-খোদাইয়ের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শুনেছে সেই অফিসারের কাছ থেকে। ঘটনাটা সে রসিয়ে বর্ণনা করলেও কিভাবে তার ভাই মারা গেল সে সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করল না।

গতরাতের চেয়ে আজকে সূর্যমুখী ফুলের গন্ধটা যেন একটু তীব্র ঠেকল আমার কাছে। আমার বমিভাব হলো, অস্বস্তিবোধ হতে লাগল, গন্ধটার মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, এরকম অনুভূতি আজকেও হলো। ঘোমটার আড়ালে মহিলার মুখখানা দেখার ইচ্ছে এবারও প্রবল হয়ে উঠল, কিন্তু তাকে কথাটা বলার সাহস যথারীতি হলো না।

রাত দ্বিপ্রহরে পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ, সকল সৌন্দর্য নিয়ে হেসে উঠল চাঁদ। ছবি তোলার মোক্ষম সময় উপস্থিত।

'যেখানে বসে আছেন সেখানেই বসে থাকুন,' বললাম আমি। 'আমি এক্ষুণি ফিরছি।' পাথুরে ঝর্ণাটার কাছে চলে এলাম, তুলে নিলাম ফ্ল্যাশল্যাম্প। এক মুহূর্ত সময় নিলাম পজিশন ঠিক করতে, তারপর ক্যামেরার শাটার লেভেলে চেপে বসল আমার আঙুল। মহিলা স্থির বসে আছে বেঞ্চে, আমি কি করতে যাচ্ছি নিশ্চয়ই বুঝে উঠতে পারেনি এখনও। ক্যামেরা থেকে মহিলার অবস্থান বেশ সুবিধেমত জায়গায়। ক্লিক করে শব্দ হলো একটা, বাগানের একাংশ ঝলসে উঠল তীব্র সাদা আলোতে। ছবি তোলা হয়ে গেছে। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে হাসতে হাসতে বললাম, 'ছবিটা চমৎকার উঠেছে কোন সন্দেহ নেই।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল মহিলা।

'গর্দভ!' কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল সে। 'রামগর্দভ! এ তুমি কি করলে?'

ঘোমটাটি এখনও তার মুখ ঢেকে রেখেছে কিন্তু তার চোখ দেখতে পেলাম আমি স্পষ্ট। তীব্র ঘৃণায় জ্বলছে। সোজা দাঁড়িয়ে আছে সে, মাথাটা হেলে গেছে পেছনে, শরীর টান টান হয়ে আছে তারের মত। হঠাৎ ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। আর কোন কথা না বলে সে দৌড়ে চলে গেল অন্ধকার বাড়িটির দিকে। এক মুহূর্ত পরে অদৃশ্য হয়ে গেল বড় ঝোপের আড়ালে।

আমি ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম, বিস্মিত। অকস্মাৎ বাড়িটির ছায়ার আড়াল থেকে ভেসে এল একটা জানোয়ারের চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন।

সরে দাঁড়াবার আগেই, লম্বা ঝোপঝাড় ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করল ওটা তার বিশাল, ধূসর শরীর নিয়ে, প্রকাণ্ড লাফ মেরে এগিয়ে এল আমার দিকে। জানোয়ারটা মহিলার সেই কুত্তাটা, গতকাল যেটাকে দেখেছিলাম। কিন্তু ওটাকে এখন মোটেও শান্তশিষ্ট মনে হচ্ছে না। পৈশাচিক ক্রোধে ওটার চেহারা বিকট আকার ধারণ করেছে, চোয়াল বেয়ে লালা ঝরছে। আতঙ্কে জমে গেলাম আমি। ওটার ফুলে ওঠা সাদা নাক, বিস্ফারিত কালো চোখের তারার ভয়ঙ্কর দৃষ্টির কথা জীবনেও ভুলব না আমি।

এক বিরাট লাফ মেরে জানোয়ারটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। মাত্র ফ্ল্যাশল্যাম্পটা হাতে নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই প্রবল

ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম মাটিতে। ফ্ল্যাশল্যাম্পের বালব সশব্দে বিস্ফোরিত হলো, টের পেলাম দানবটা শক্ত চোয়ালে কামড়ে ধরেছে ক্যামেরার হাতল।

কুত্তাটা তার শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে চেপে আছে আমার গায়ে, প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠলাম আমি। দুম করে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসালাম জানোয়ারটার কুৎসিত মুখে। হাত দিয়ে চেপে ধরলাম ওটার গলা, আঙুলগুলো দেবে গেল লোমশ মাংসে।

প্রচণ্ড চাপে কুত্তাটার প্রায় বারোটা বাজার দশা হয়ে ছিল। গলা দিয়ে বিদঘুটে একটা আওয়াজ করে ওটা আমাকে ছেড়ে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি ধাঁই করে লাথি বসালাম ওটার শরীরের মাঝখানে।

'ফোর্ট মিট ডির জোহান' মহিলার জার্মান নির্দেশের অনুকরণে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

পিছু হঠে গেল কুত্তাটা, এখনও হিংস্রভাবে খোলা ওর মুখ, বেরিয়ে আছে ঝকঝকে দাঁতের সারি। ওটা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল এক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দৌড়ে চলে গেল ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে।

দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি, আতঙ্ক সামলে উঠতে অনেক সময় লাগল। সুস্থির হয়ে ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে এগোলাম গেটের দিকে।

তিনদিন আর ঘর ছেড়ে বেরোলামই না। কুত্তাটার আক্রমণের ক্ষতের পরিচর্যা করতে গিয়েই কেটে গেল দিনগুলো। কুত্তাটার সঙ্গে লড়াইয়ের দিন বাসায় ফিরেই বুঝতে পারলাম আপাতত কয়েকদিন আর কাজে যাওয়া সম্ভব হবে না। ঘরে ঢুকে প্রথমেই দু'কাপ কড়া কালো কফি খেয়ে চেয়ারে বসলাম। উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা চালালাম। কিন্তু টেবিলের ওপর রাখা ক্যামেরার দিকে চোখ পড়তেই বিশ্রাম মাথায় উঠল আমার। পাঁচ মিনিট পরেই ডার্ক রুমে গিয়ে ঢুকলাম আমি। ছবি ডেভেলপ করতে করতে ভাবলাম জেনেভার ফটো প্রতিযোগিতায় পাঠানোর মতই কাজ হবে বটে।

কিন্তু ভেজা প্রিন্ট হাতে নিয়ে ওটার দিকে তাকাতেই বিস্ময়ের বিরাট এক ধাক্কা খেলাম আমি। ছবিতে পুরানো বাগান, ঝোপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, নিখুঁত এসেছে বাচ্চাটার আকৃতি, ঝর্ণা এবং পেছনের পটভূমিতে দেয়ালও, কিন্তু বেঞ্চ—লোহার বেঞ্চটি সম্পূর্ণ খালি। কালো পোশাক পরা মহিলার কোন চিহ্নই নেই গোটা ছবিতে।

জলে মার্কুরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে নেগেটিভটি আবার ধুলাম আমি, তারপর ওটাতে ফেরাস অক্সালিট দিলাম। কিন্তু এত নিখুঁত প্রসেসিং এর পরেও দ্বিতীয় প্রিন্টটির অবস্থা হলো তথৈবচ, সবকিছুই দৃশ্যমান ছবিতে, শুধু মহিলার কোন খবর নেই।

অথচ আমি যখন শাটার টিপি, স্পষ্ট মনে আছে, মহিলা আমার ক্যামেরার রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। আর আমার ক্যামেরাতেও কোন ক্রটি নেই। তাহলে সমস্যাটা কোথায় হলো? ঠিক আছে, কাল দিনের আলোতে ওটাকে আবার ভাল করে পরীক্ষা করব, এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুমাতে গেলাম।

কিন্তু রাতে ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল আমার। বালিশ থেকে

মাথা তুলতে পারছি না। সারা শরীর ভারী ঠেকল, যেন অবসাদ গ্রাস করেছে আমাকে। হাত-পায়ে সাড়া নেই, হার্টও খুব দুর্বল লাগল। সারা ঘরে দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। জানালা খোলা, বাতাসে পতপত করে উড়ছে পর্দা। অথচ ঘুমাতে যাবার আগে আমি ওটা ভাল করে বন্ধ করেছি।

হঠাৎ তীব্র ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি। সেই গন্ধটা পাচ্ছি! খুব ধীরে সূর্যমুখী ফুলের গন্ধ আমার ফুসফুসে ঢুকতে শুরু করল।

পরদিন সকাল। ভেবেছিলাম রাতের ঘটনাটা আসলে একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। কিন্তু আমার তীব্র মাথা ব্যথা, হাত পায়ের কাঁপুনি মনে করিয়ে দিল ওটা কোন স্বপ্ন ছিল না। এতই দুর্বল হয়ে পড়েছি উঠে দাঁড়াতেও প্রচণ্ড কষ্ট হলো। ডাক্তার এসে আমাকে পরীক্ষা করে দেখলেন। পাল্‌স্‌ পরীক্ষার সময় তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

'আপনার যে কোন সময় স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে।' বললেন তিনি। 'যদি পূর্ণ বিশ্রাম না নেন তাহলে এটা স্থায়ী ভাবে আপনার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ও ভাল কথা, আপনার ঘাড়ে দুটো ছোট্ট কাটা চিহ্ন দেখলাম। আরও দু'এক জায়গায় ক্ষত চিহ্ন দেখলাম। এগুলো কিভাবে হলো?'

গলায় আঙুল ছোঁয়াতেই রক্ত লেগে গেল নখে।

'আ আমি ঠিক জানি না,' তোতলাতে তোতলাতে বললাম আমি। ডাক্তার কিছুক্ষণ তার ওষুধপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি এক সপ্তাহ'র আগে বিছানা থেকে উঠবেন না যেন,' বললেন তিনি। 'আপনার পুরো শরীর চেকআপ করাতে হবে, দেখব অ্যানেমিয়ার কোন লক্ষণ আছে কিনা।' বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁকে কেমন হতভম্ব মনে হলো আমার।

পরবর্তী কয়েকটা দিন আমার কাটল বিক্ষিপ্ত চিন্তায়। প্রতিজ্ঞা করলাম আর এসব বিষয় নিয়ে ভাবব না, শীঘ্র কাজে যোগ দেব, অভিশপ্ত বইগুলোর দিকে আর ফিরেও তাকাব না। কিন্তু জানতাম আমি তা পারব না। মহিলা আমার মনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারছিলাম না বলে রীতিমত মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলাম। আর আলেসান্দ্রোর দ্বিতীয় খণ্ড পড়া হয়ে যাবার পর তৃতীয় খণ্ড পড়ার ইচ্ছেটা এত ভয়ানকভাবে জেগে উঠল মনে যে আর নিজেকে সামাল দেয়া গেল না।

অসুস্থ শরীর নিয়েই তৃতীয় দিন সকালে একটা ক্যাব নিয়ে চলে গেলাম লারলার দোকানে। কিন্তু লারলা এবার ইস্পাতের মত শক্ত। কিছুতেই সে তার ভাইয়ের লেখা তৃতীয় খণ্ডটি দেবে না। কারণ এর আগে যে দুটো খণ্ড আমি নিয়েছি একটাও ফেরত দেইনি। ওগুলো ফেরৎ না দেয়া পর্যন্ত সে আমার কোন কথাই শুনবে না। শত অনুরোধেও কাজ হলো না দেখে আমাকে একটি ছোট্ট অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হলো। কারণ তৃতীয় খণ্ডটি পড়ার জন্য আমি তখন প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছি।

লারলা কি কাজে যেই পেছন ফিরল সঙ্গে সঙ্গে আমি শেলফে রাখা আলেসান্দ্রোর তৃতীয় খণ্ডটি কৌশলে পকেটে পুরে হাওয়া হয়ে গেলাম দোকান থেকে।

বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ দোটানায় ভুগলাম। বইটি পড়ব কি পড়ব না এই

সিদ্ধান্তহীনতা অনেকক্ষণ কাজ করল মনে। কিন্তু লারলার এই বই গত পাঁচদিনে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে অঙ্গাঙ্গীভাবে। ওর লেখা এই তৃতীয় খণ্ড কি আমার অজানা সকল প্রশ্নের জবাব দেবে? উন্মোচন হবে কি সকল রহস্যের?

শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হলো। বইটি পড়তে শুরু করলাম আমি, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ছি, কিন্তু কে জানি ভেতর থেকে বারবার সাবধান করে দিল আর যেন না এগোই। কিন্তু প্রবল আগ্রহের কাছে সকল বাধা পরাস্ত হলো। আমি পড়ে যেতে লাগলাম।

হঠাৎ শেষ পাতার শেষ প্যারায় চোখ আটকে গেল আমার। লেখাটা বার বার পড়লাম, প্রতিটি অক্ষর, শব্দ এবং বাক্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করলাম। তারপর তীব্র আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করল। রক্তলাল কালিতে ওখানে লেখা:

এখন আমি কি করব? সে আমার রক্ত চুষে খেয়েছে এবং আমার আত্মাকে করেছে অপবিত্র। আমার মুক্তো আসলে একটি অশুভ শক্তি। তার ভাইয়ের ওপর অভিশাপ, এ জন্যেই সে তাকে এভাবে তৈরি করেছে। আমি প্রার্থনা করছি এই পৃষ্ঠায় বর্ণিত সকল সত্য তাদের চিরকালের জন্য ধ্বংস করবে। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করো, পার্ল ভন মরেন আর তার ভাই জোহান, দু'জনেই ভ্যাম্পায়ার!

লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'ভ্যাম্পায়ার!'

আরেকটু হলেই টলে পড়ে যাচ্ছিলাম, কোন মতে টেবিলের কোনা ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে শরীরে। ভ্যাম্পায়ার! সেই ভয়ঙ্কর সৃষ্টিগুলো, যারা শুধু মানুষের রক্ত তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে থাকে আর ইচ্ছে করলেই রূপ নিতে পারে মানুষ, বাদুর কিংবা কুকুরে।

গত কয়েকদিনের ঘটনা ছবির মত স্পষ্ট ফুটে উঠল চোখে, সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল যেন নিমিষে। মহিলার ভাই, জোহান যুদ্ধের কোন এক সময় ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হয়। মহিলা যখন তাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে তখন সে বোনকেও ভ্যাম্পায়ারে পরিণত করে।

বছর খানেক আগে এই ভ্যাম্পায়ারদের মরণ কবলে পড়ে আলেসান্দ্রো লারলা। মহিলাকে ভালবাসত সে, মনে প্রাণে তাকে চাইত, কিন্তু যখন আসল ঘটনা জেনে যায় আলেসান্দ্রো, প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে পাগল হয়ে যায় সে। হ্যাঁ, পাগল হয়েছিল আলেসান্দ্রো, কিন্তু তারপরও নিজের জীবনকাহিনী লেখার মত মানসিক ভারসাম্যটুকু তার ছিল, সে আশা করেছিল তার এই বই ওই মহিলা এবং তার ভাইয়ের স্বরূপ প্রকাশ করবে৷ কিন্তু তার আগেই মারা যায় আলেসান্দ্রো।

আমি তাড়াতাড়ি আলেসান্দ্রোর প্রথম খণ্ডটি আবার খুললাম। হিজিবিজি লাইনের যে কথাগুলো আমার আগে দুর্বোধ্য ঠেকেছিল সেগুলো আবার পড়লাম।

'বাইবেলের শেষ পুস্তক উদঘাটিত রহস্য সমূহ' মানে কোন কিছুর ধ্বংস সাধন, কিন্তু শুধু খুঁটি ছাড়া বন্ধন, পড়ো, বোকা এবং আমার ভুবনে প্রবেশ করো, কারণ আমরা একই সুতোয় গাঁথা। অভিশাপ নেমে আসুক লারলার ওপর।

এটা পার্ল ভন মরেন নিজেই লিখেছে। আসলে সে এবং তার ভাই জোহান ওই পুরানো বাগান বাড়িতেই বাস করে এবং রাতের বেলা শিকার খুঁজে বেড়ায়। যে

একবার ওই খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকে সে-ই তৎক্ষণাৎ তাদের শিকারে পরিণত হয়। আর এই বইটি পড়ার পর পাঠক সম্মোহিত হয়ে পড়ে তাদের মায়ার জালে। ছুটে যায় ওই অভিশপ্ত বাগান বাড়িতে। আলেসান্দ্রোও নিশ্চয়ই এভাবেই তাদের ফাঁদে পড়েছিল। আর আমিও ওদের নিশীথ তৃষ্ণার কবলে মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ডাক্তার আমার দিকে অমন অদ্ভুত ভাবে তাকাচ্ছিলেন কেন? আর আমিও বা অত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম কেন? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। পিশাচীনিটা আমার রক্ত খেয়েছে। কিন্তু লারলা এই শয়তানগুলোর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার উপায় না জানলেও আমি জানি। জানি কিভাবে এগুলোকে শায়েস্তা করতে হয়।

উন্মাদের মত আমি ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলাম। চেয়ার টেবিল ঘুরে আমার দৃষ্টি স্থির হলো তিনঠেঙে একটি লম্বা টেবিলের ওপর। ওটাতে আমার ক্যামেরা রাখা। একঝটকায় কাঠের টেবিলটার দুটো ঠ্যাঙ ভেঙে ফেললাম, মাথার দিকে ওদুটো গোঁজের মতই তীক্ষ্ণ। তারপর ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

একটা ক্যাব ডেকে ওটাতে উঠে ড্রাইভারকে বললাম, 'জোরসে চালাও। যত জোরে পারো!' বিদ্যুৎ গতিতে আমরা পার হয়ে এলাম তে-মাথা আর চৌমাথার রাস্তাঘাট, পুরানো ঘিঞ্জি এলাকা, এগিয়ে চললাম শহরের বাইরের এলাকার দিকে। ট্রাফিক জ্যামে গাড়ি বেশ কয়েকবার আটকে গেল। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল আমার। গালির চোটে চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করলাম ট্রাফিক পুলিসদের। শেষপর্যন্ত বাগানবাড়ির গেটে এসে পৌঁছুলাম।

আমি ঝটাং করে কারুকাজ করা লোহার গেট খুলে বগলে কাঠের গোঁজ দুটো গুঁজে ছুটলাম ভেতর পানে। দিনের আলোয় সবকিছু স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম সদর দরজার মুখে। কিন্তু বন্ধ দরজা। এবার আমি বাড়িটির দক্ষিণ দিকের দেয়াল উদ্দেশ্য করে চক্কর দিতে শুরু করলাম। কারণ ছবি তোলার পর মহিলাকে এই পথে পালিয়ে যেতে দেখেছি। দেয়াল ধরে বাড়িটির পেছনের অংশে চলে এলাম। আধখোলা একটা দরজা চোখে পড়ল সেলার-সংলগ্ন। ভেতরে অন্ধকার সরু একটি করিডর। মেঝেতে নুড়ি পাথর, রাজমিস্ত্রীর কাঠের জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো, ছাদে হাজার হাজার মাকড়সার জাল।

করিডরের শেষ মাথায় আবারও একটি দরজা। আমি লাথি মেরে দরজাটা খুললাম—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালাম ভেতরের দিকে।

ভেতরে ছোট একটা ঘর, দশফিটের বেশি হবে না দৈর্ঘ্যে প্রস্থে, ছাদটা ঢালু। খোলা দরজা দিয়ে প্রতিফলিত আলোয় দেখলাম মেঝের মাঝখানে রাখা আছে জিনিস দুটো—কাঠের দুটো কফিন।

পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই আমার। কিন্তু ঘরটা থেকে ভেসে আসা একটা সুগন্ধ আমাকে সচকিত করে তুলল: সূর্যমুখী ফুলের গন্ধ! কিন্তু এই সুবাস ছাপিয়ে পুরানো কবরের বিশ্রী এবং পচা একটা গন্ধ

নাকে এসে ধাক্কা দিল।

আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, এক লাফে পৌঁছে গেলাম কাছের কফিনটার ধারে, ঢাকনি ধরে দিলাম টান, খুলে এল ওটা।

যা দেখলাম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো। ওখানে শুয়ে আছে কালো পোশাকধারী সেই মহিলা। তবে মুখে কোন ঘোমটা নেই।

তার মুখখানা অপূর্ব সুন্দর, যেন স্বর্গের সুষমা মাখা, মখমলের মত মসৃণ কালো চুল, চিবুক দুধের মত সাদা। কিন্তু ঠোঁট—! গা গুলিয়ে উঠল আমার ঠোঁট জোড়ার দিকে চেয়ে। টকটকে লাল ঠোঁট···মানুষের রক্ত মাখা। আমি একটা কাঠের গোঁজ তুলে নিলাম হাতে, মেঝে থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে গোঁজটা মহিলার ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর বসালাম। তারপরই প্রচণ্ড শক্তিতে টুকরোটা দিয়ে বাড়ি দিলাম গোঁজটাতে। বিশ্রী একটা শব্দ করে তীক্ষ্ণ গোঁজটা পড়পড় করে ঢুকে গেল মহিলার বুকের মধ্যে। ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল কফিন। গরম দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থটা ছিটকে এল আমার মুখে।

পিশাচীকে শেষ করে এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লাম ওর ভাইয়ের কফিন নিয়ে। কফিনের ঢাকনা খুলে ফেলতেই ভেতরে শুয়ে থাকা সুদর্শন এক তরুণকে দেখতে পেলাম। চোখ বুজে আছে। ঠিক আগের পদ্ধতিতে দ্বিতীয় কাঠের গোঁজটা সর্বশক্তি দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম ভ্যাম্পায়ারটার বুকে।

কফিন দুটোর মধ্যে এখন চোখহীন দুটো কঙ্কাল শুয়ে আছে, কোটর দুটো যেন বিকট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বাকি ঘটনা আমার কাছে এখনও স্বপ্নের মত মনে হয়। মনে আছে কাজ শেষ করেই আমি দৌড়ে বেরিয়ে আসি অভিশপ্ত বাড়িটি থেকে, ওটার ক্ষুধার্ত চোয়ালের নাগালের বাইরে।

প্রায় বিধ্বস্ত শরীরে ফিরে এলাম আমি নিজের বাড়িতে। ভূতুড়ে বাড়িটির সকল দৃশ্য তখনও আমার চোখে ভাসছে। কিন্তু আমি সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলাম টেবিলের ওপর রাখা লারলার তিনটে বইয়ের প্রতি।

বই তিনটে হাতে নিয়ে ঘরের কোনায়, ফায়ার প্লেসের সামনে চলে এলাম। একে একে সবগুলো বই নিক্ষেপ করলাম জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে।

হিসহিস একটা শব্দ উঠল, পরক্ষণে হলুদ আগুনের লম্বা জিভটা ঝলসে উঠল, গ্রাস করল ওটা মখমলের চামড়ায় মোড়ানো অভিশপ্ত বই তিনটেকে। আগুনের উজ্জ্বলতা ক্রমশ বেড়ে চলল···বাড়তেই থাকল··· এক সময় প্রায় নিভে এল ওটা।

শেষ পর্যন্ত যখন স্ফুলিঙ্গের শেষ বিন্দুটাও নিভে গেল, স্বস্তি আর শান্তির ঝিরঝিরে একটা পরশ যেন বয়ে গেল আমার দেহ-মনে।

শয়তানের পিয়ানো

মাঝরাত। বসে আছি আমি আমার স্টাডিরুমে পুরানো পিয়ানোটার সামনে। 'সেইন্ট সেঙ্গ ডনস ম্যাকাবর'-এর সুর তুলছি কীবোর্ডে। বাইরে প্রচুর কুয়াশা পড়েছে, জানালার কাঁচে জল গড়াচ্ছে। বাতাসে সুরের মূর্ছনা।

ঘুম আসছে না আমার। খুব একা অনুভব করছি। মার্থা, আমার বাগদত্তা গ্রামের বাড়িতে গেছে দিন কয়েক ছুটি কাটাতে। ওর অভাব খুব অনুভব করছি। তবে এই মুহূর্তে ভাবছি চেয়ারের ওপর রাখা কাগজের টুকরোটাকে নিয়ে। একটা চিঠি। কিছুক্ষণ আগে পোস্টম্যান দিয়ে গেছে। চিঠিতে লেখা: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ৯৪, মিলফোর্ড লেনে আমার বাসায় চলে এসো। দারুণ একটা জিনিস তোমাকে দেখাব। জিনিসটা তোমার সংগীতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উইলসন ফারবার।

উইলসন ফারবারকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। টেলিং স্ট্রীটে ওর ছোট একটা দোকান আছে। মিউজিক শপ। রাশিয়ান ফোক-ড্যান্সের ওপর কিছু পুরানো কালেকশনের সন্ধানে গিয়েছিলাম ওখানে এক সন্ধ্যায়। পছন্দের জিনিস না পেলেও লোকটার সঙ্গে আমার আলাপ বেশ জমে উঠেছিল। মনোজগৎ সম্পর্কে ফারবারের জ্ঞান আমাকে বিস্মিত করে তোলে। ফারবার একটা বই লিখেছিল সম্মোহন এবং টেলিপ্যাথির ওপরে। মনোবিজ্ঞানীরা বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বলেছেন হিপনোটিজম এবং টেলিপ্যাথির নতুন জগৎ উন্মোচন করেছে এই পুস্তক।

আমি উইলসন ফারবারের দোকানে আবারও ঢুঁ মেরেছি। অস্বীকার করব না সাহিত্য সম্পর্কে লোকটার অসামান্য পাণ্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু ফারবারের চেহারা এবং চাউনিতে এমন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল যে আমি প্রায়ই বিব্রত অনুভব করতাম। ওর চোখ যেন মানুষের অন্তরের ভেতরটাও দেখতে পায়। আবলুস কাঠের মোটা ছড়ি দিয়ে ওর অনাবশ্যক মেঝেতে ঠুকঠুক কিংবা ভেনট্রিলোকুইদের মত কর্কশ হাসি আমার একটুও পছন্দ হত না।

লম্বা, রোগা চেহারার উইলসন ফারবারের চুল বাদামী। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ওর চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। লোকটার প্রথম বই প্রকাশ হওয়ার পরে তার সম্পর্কে বিভিন্ন গুজব-গুঞ্জন শোনা যেতে থাকে। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে বইটা কি আদৌ কোন সুস্থ মানুষের লেখা নাকি কোন উম্মাদের কাজ? এই বইয়ের লেখকের সঙ্গে জনৈক জেমস উইলসন ফারবারের মিলও খুঁজে পেল কেউ কেউ। এই উইলসন বইটি প্রকাশ হওয়ার আগে সেন্ট মেরী ইনসটিটিউশন নামে এক পাগলা গারদ থেকে বছর খানেক আগে ছাড়া পেয়েছিল।

উইলসন ফারবারের চিঠিটাকে আমি পাত্তা দিতে চাইলাম না। কিন্তু ওর দোকানের ছবিটা আমার চোখে বারবার ভেসে উঠল। কারণ দিন কয়েক আগে ফারবার কিছু দুষ্প্রাপ্য, পুরানো আমলের কমপোজিশন সংগ্রহ করেছে বিক্রির জন্য।

ফারবার আমার দুর্বলতার কথা জানে। জানে আমি বহু আগে থেকে অরিজিন্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট এবং অজানা সুরকারদের হারানো কাজ সংগ্রহ করে চলেছি। এই কাজগুলো করে আমি এত আনন্দ পাই যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। এই সংগ্রহগুলো থেকে আমি পিয়ানোতে নতুন সুর সৃষ্টি করি।

এই মুহূর্তে মিউজিক কমপোজিশনের কাজটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে আমি আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে অর্ধসমাপ্ত একটা উপন্যাস টেনে নিলাম হাতে। গল্পটার মধ্যে শীঘ্রই ডুবে গেলাম, ফারবার বিষয়ক চিন্তা মাথা থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু মিনিট পনেরো পরেই টের পেলাম আমার চোখ বারবার চলে যাচ্ছে চেয়ারে রাখা চিঠিটার দিকে।

তৃতীয়বারের মত চিঠিটা পড়লাম। হঠাৎ মাথায় কি ভূত চাপল, লাফিয়ে উঠলাম চেয়ার ছেড়ে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রেঞ্চকোট আর ক্যাপ পরে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

একটা ক্যাব ভাড়া করে উঠে পড়লাম। বৃষ্টিস্নাত রাস্তায় ছুটে চলল গাড়ি ঘন কুয়াশা ভেদ করে।

মিলফোর্ড লেন আমার বাসা থেকে আধঘণ্টার পথ। রাত একটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম ৯৪ নম্বর বাড়ির জীর্ণ দরজার সামনে। রাস্তার একমাত্র বাতিটার আলো পড়েছে ইট আর পাথরের তৈরি প্রাচীন বাড়িটার ওপর। খানিকক্ষণ ইতস্তত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলাম দরজার সামনে, কুয়াশা আর মিহি বৃষ্টির কণা ভিজিয়ে দিচ্ছে মুখ। দূরে কোথাও একটা ট্রাম চলে গেল। শব্দটা এই অদ্ভুত নৈশব্দে বেশ কানে বাজল। সামনে পা বাড়ালাম আমি, কড়া নাড়লাম।

দরজা খুলল উইলসন ফারবার নিজেই। ওর কালো চোখের দিকে তাকিয়ে বরাবরের মত কেন জানি শিউরে উঠলাম আমি।

'তুমি আমাকে খবর দিয়েছ—' শুরু করলাম আমি।

মাথা ঝাঁকাল সে। 'তুমি কষ্ট করে এসেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি, ব্যানক্রফট। তবে জিনিসটা দেখার পর তোমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে, গ্যারান্টি দিচ্ছি। এসো, ভেতরে এসো।'

অন্ধকার একটা বারান্দা দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আমাকে ফারবার। বাড়িটার পেছনদিকে উজ্জ্বল, আলোকিত একটা ঘরে ঢুকলাম আমরা। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সে আমার দিকে। বসতে ইশারা করল। কোটের বোতাম খুলতে খুলতে ঘরটার চারদিকে চোখ বোলাতে লাগলাম আমি। সত্যি বলতে কি দৃশ্যগুলো দেখে বিস্ফারিত হয়ে উঠল আমার চোখ। বাজি ধরেই বলতে পারি সারা লন্ডন শহরে এমন অদ্ভুতভাবে সাজানো ঘর দ্বিতীয়টি নেই।

চারটে দেয়ালই ফ্যাকাসে সাদা রঙের, তার ওপর কালো রঙ করা। ছাদ থেকে শুরু করে মেঝে পর্যন্ত সংগীতের পাঁচটি ধাপ আঁকা, সমস্ত স্বরলিপি লেখা আছে গোটা ঘর জুড়ে। দেয়ালে দুই ফুট পর পর ফাঁকা জায়গা, ওখানে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ঝোলানো। কিম্ভূত এবং বিকটদর্শন যন্ত্রগুলো দেখে আমার গা শিরশির করে উঠল, ভাল লাগল না মোটেই। অনেকগুলো বীণা, ভাঙাচোরা, ছেঁড়া তার, একটা সানাই, একটা ম্যানডোলিন, একটা জাভানীজ ড্রাম, আর বেশ কিছু অদ্ভুতদর্শন লম্বা

শিঙা। দেয়ালের এক মাথায় দাঁড় করানো পুরানো আমলের একটা হারপিসকর্ড। দুটো জানালাই ভারী, কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা, ঘরের মাঝখানে সাদা রঙের একটা অপারেটিং টেবিল। ওটার মাথায় নীল শেডের বাতি ঝুলছে।

আমার ডানধারে একটা ডেস্ক। বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি, কেমিক্যালের বোতল আর ছড়ানো ছিটানো কয়েকটি বই চোখে পড়ল ওটার ওপরে। বইগুলোর শিরোনাম পড়লাম। কিছু বই সংগীত আর সুরের ওপর লেখা, বাকিগুলো সবই সম্মোহন আর টেলিপ্যাথি সংক্রান্ত।

ফারবার আমার দিকে ঝুঁকে এল, একটা গ্লাস আর পানীয়ের বোতল রাখল সামনে, ইঙ্গিত করল ঢেলে নিতে।

মাথা নাড়লাম আমি। 'নাহ্ এখন আর এসব খাওয়ার সময় নেই। অনেকদূর ফিরতে হবে আমাকে। তারচে' বলো আমাকে কেন ডেকেছ।'

নিজের চেয়ারে বসল ফারবার, কালো কোটের পকেটে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে আমাকে চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড দেখল।

'ব্যানক্রফট' তারপর বলল সে, 'তুমি খুব নাম করা একজন পিয়ানোবাদক এবং সুরকার। তাই না?'

জবাব দেয়ার আগে ওর দিকে আমি সতর্ক দৃষ্টিতে চাইলাম। ওর চেহারা থেকে যেন অসীম শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুখের প্রতিটি রেখায় নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞার ছাপ; যেন ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছতে যাচ্ছে, ওকে ঠেকাবার ক্ষমতা কারও নেই। নীলচে ঠোঁট দুটো হালকা হাসছে, মৃদু অবজ্ঞার ভাব। ঘন ভ্রূর নিচে চোখ জোড়ায় ঝকমক করছে অদ্ভুত এক জ্যোতি।

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে তা বলতে পারো,' বললাম আমি। 'গত কয়েক বছর সুরকার এবং পিয়ানোবাদক হিসেবে আমি বেশ খ্যাতি পেয়েছি। যদিও আমি প্রচুর লিখেছি, কিন্তু আমার রচিত একটা সংগীতই শুধু জনপ্রিয়তা পেয়েছে।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল সে। 'জানি' বলল ও। 'শয়তানের নৃত্য। গত এক দশকে আধুনিক সংগীতের জগতে বেশ আলোড়ন তুলেছে তোমার এই সৃষ্টি। তুমি এখন সোনাটা নিয়ে কাজ করছ। প্ল্যান করেছ আগামীতে ওটা কেনসিংটন হল-এ বাজাবে।'

'তুমি কি আমাকে অনুগ্রহ করে বলবে এই খবরটা কোত্থেকে পেয়েছ?' ঠাণ্ডা গলায় বললাম আমি। 'কারণ ব্যাপারটা শুধু আমি নিজেই জানি বলে আমার ধারণা ছিল।'

হাত ঝাপটা দিয়ে প্রশ্নটাকে যেন দূরে সরিয়ে দিল ফারবার। 'ওটা জানা ছাড়াও,' বলল সে, 'আমি এমন কিছু ঘটনার কথা জানি যেগুলো শুনলে পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। যখন সময় আসবে···যাকগে, কিছু মনে কোরো না। আমি এখন যা জানতে চাইছি তা হলো সুর সৃষ্টিতে তোমার পদ্ধতিটা কি ধরনের?'

'পদ্ধতি?' প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

'হ্যাঁ, ধরো, তুমি শয়তানের নৃত্যটা কি করে লিখলে? তোমার কাজ করার ধরনটা কিরকম ছিল?'

প্রশ্নটা এত সাধারণ এবং নীরস ঠেকল যে আমি হতাশ অনুভব করলাম। এই সময়ে এত পথ পাড়ি দিয়ে একজনের বাড়িতে এসে কিনা রুটি রোজগার কি করে করি সেই মামুলী প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে!

'সত্যি বলতে কি,' বিরক্তি চেপে বললাম আমি, 'সংগীতে সুর সৃষ্টির ব্যাপারটা লেখালেখি থেকে খুব একটা আলাদা কিছু নয়। যেমন ধরো, উপন্যাস। এতে অর্ধেক দরকার অনুপ্রেরণা বাকিটা দক্ষতা। আর সংগীতের ব্যাপারটাও তেমন। একটা প্রধান থিম তৈরি করি আমি, সুরগুলো এরপর মন থেকেই আসে। তারপর পিয়ানো নিয়ে বসে যাই, সুরটা বারবার বাজাই—তারপর যতটুকু মনে থাকে স্বরলিপিগুলো লিখে রাখি খাতায়। ব্যস, এই তো।'

পাতলা ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো। সন্তুষ্টির হাসি হাসল উইলসন ফারবার। 'এই পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় সবচে' কঠিন সমস্যা মনে হয় তোমার কোনগুলোকে?'

'যখন সুরগুলো পিয়ানোতে তুলি তখন,' বললাম আমি। 'তারপর সেগুলো আবার খাতায় লেখার সময় আসল সুরের অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলি। এটা আমাকে বেশ কষ্ট দেয়।'

সামনে রাখা বোতলের দিকে হাত বাড়াল ফারবার, গ্লাস ভর্তি করল, ছোট ছোট চুমুক দিতে শুরু করল।

'ধরো,' বলল সে। 'তোমাকে একটা ইন্সট্রুমেন্ট দেয়া হলো—একটা যন্ত্রই মনে করো—যন্ত্রটার মধ্যে এমন কিছু জিনিস থাকবে যার ফলে ওটা তোমার মস্তিষ্কের সমস্ত সুর ধারণ করতে পারবে এবং তুমি যা ভাবছ সেই সুরই সে বাজাতে থাকবে, যন্ত্রটা এত নিখুঁত হবে যে তোমার মনের সমস্ত স্বরলিপি সে বাজিয়ে চলবে। তোমার প্রতিটি চিন্তা সে খাতায় ফুটিয়ে তুলবে। এরকম হলে কেমন হবে, বলো তো?'

'এরকম কোন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হলে,' ধীরে ধীরে বললাম আমি, 'এর আবিষ্কর্তা একদিনের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে। দুর্দান্ত এক সংগীত পরিচালকে পরিণত হবে সে, হয়ে উঠবে সংগীত জগতের অসামান্য এক প্রতিভা। কিন্তু এ এক কথায় অসম্ভব। বিজ্ঞানের কিছু ব্যাপার জানি আমি, জানি টেলিপ্যাথি সম্পর্কেও—কিন্তু তুমি যা বললে সেটা সৃষ্টি কখনোই সম্ভব নয়। ক্রিমিনাল কোর্টে মাইন্ডরিডিং মেশিনের ব্যবহারের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু ওগুলো তো লাই-ডিটেকটর। কেউ মিথ্যে কথা বললে মেশিনে ধরা পড়ে যায়।'

কোন কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফারবার, রুমের সঙ্গে লাগোয়া একটা দরজার দিকে এগোল। অদৃশ্য হয়ে গেল ওধারে। নীরবতা গ্রাস করল আমাকে। আগডুম বাগডুম ভাবতে শুরু করলাম আমি। এই ফারবার লোকটা আসলে কি করছে? সংগীত নিয়ে এত কথা বলার কারণটা কি? আর আমার মত লোকই বা কিসের জন্য এসেছি এখানে? ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা টিক টিক করে পার হয়ে যাচ্ছে কালো দাগগুলো, টের পেলাম এক ধরনের অস্বস্তিবোধ আমাকে ঘিরে ধরছে।

একসময় অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি। ভারী পর্দা ঢাকা জানালাগুলোর দিকে এগোলাম, কাপড় সরিয়ে তাকালাম বাইরে। বড় বড় গরাদ জানালাটায়। নিজেকে হঠাৎ বন্দীর মত লাগল। খোলা দরজার দিকে ফিরলাম। ঘরে ঢুকল ফারবার।

আউল ফাউল ভাবার জন্য মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলাম আমি।

টলতে টলতে এগোল ফারবার, ঝুঁকে আছে সামনে, হাতে ধরা কালো কাপড়ে মোড়া ভারী একটা বস্তু। অপারেটিং টেবিলের ওপর চৌকোনা জিনিসটা রাখল সে, ঘুরে দাঁড়াল। আমার চেয়ারটাকে টেবিল থেকে হাত তিনেক দূরে সমান্তরালে সরাল।

'ব্যানক্রফট' আমি চেয়ারে বসলে বলল সে, 'আমি এখন কিছু কথা বলব। তুমি চুপচাপ শুনবে। শান্ত হয়ে বসে চোখ দুটো টেবিলের জিনিসটার ওপর নিবদ্ধ করো। যতদূর পারো সংহত করো মন।'

জিনিসটার ওপর থেকে কাপড়টাকে সরাল ফারবার। বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেল আমার। জিনিসটা ছোট আকারের একটা পিয়ানো, আকৃতিটা কনসার্ট গ্রান্ডের মত, তিন ফিট চওড়া, আঠারো ইঞ্চির মত উঁচু। পিয়ানোর দুইপাশ গা গোলানো লাল রঙে রাঙানো ছোট কী বোর্ডের চাবি এবং খুদে তারগুলো হুবহু আসল পিয়ানোর মত। পিয়ানোর ঠ্যাংগুলো অতিশয় সরু, কাঠের কাজ অত্যন্ত নিখুঁত। যন্ত্রটাকে ঠেক দিয়ে রেখেছে শক্ত রাবারের বেস-বোর্ড, ওটার মাথায় ছোট একটা বাক্সসহ একটা গ্লাস প্যানেল। প্যানেলটায় কালো রঙের একটা ডায়াল, গোটা যন্ত্রটার চারদিকে অসংখ্য তার, অদ্ভুত চেহারার কয়েকটি বাল্ব এবং ঘন একটা কাঁচের টিউবে কিছু কালো তরল পদার্থও লক্ষ করলাম আমি।

ডায়াল অ্যাডজাস্ট, রি-অ্যাডজাস্টের কাজে কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকল ফারবার। স্টিম প্রেশার গজের মত কালো রঙের পদার্থটা গ্লাস টিউবের মধ্যে ওঠা নামা করতে লাগল। হঠাৎ হিস্‌স্‌ করে একটা শব্দ হলো, টিউবের মধ্যেকার তরল জিনিসটা লাভার মত টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। একটা বাল্বের রঙ দেখতে দেখতে টকটকে লাল হয়ে উঠল।

অবশেষে মুখ তুলে চাইল ফারবার। 'দশ বছর,' বলল সে। 'টেবিলের ওপরের এই যন্ত্রটাকে নিয়ে দীর্ঘ দশ বছর আমি গবেষণা করেছি। আজ রাতে এই কয়েক ঘণ্টা আগেও এটাকে নিয়ে আমি হতাশায় ডুবে ছিলাম। কিন্তু তুমি আসার কিছুক্ষণ আগে আমি ধরতে পেরেছি এতদিন কোথায়, কি ভুলটা আসলে করে চলছিলাম। সামান্য একটা ভুল ছিল মাত্র, কিন্তু ওটা সংশোধন করতেই গোটা মেকানিজম ঠিকঠাক কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

ডায়ালের দিকে আবার ফিরল সে, ওটাকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে শুরু করল।

'বিজ্ঞানের সবচে' বিস্ময়কর আবিষ্কারটিকে তুমি আর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাবে,' বলল সে। দ্রুত এবং উচ্চকিত হয়ে উঠেছে তার গলা, কথা বলার তোড়ে শ্বাস নিতেও পারছে না যেন। 'আজও প্রকৃত প্রতিভা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা মেলে। আর সেই প্রতিভাবানরা স্বীয় কর্মক্ষেত্রে নেতার ভূমিকা পালন করে থাকেন আসল সত্য হলো আমাদের মধ্যে প্রতিভাবান মানুষের সংখ্যা কম নেই। কিন্তু এর প্রকৃত সম্মান পাওয়া দুষ্কর। এই প্রতিভা বেশিরভাগ সময় দুনিয়ার আলো দেখার আগে মস্তিষ্কের মধ্যেই জন্ম নেয় এবং ওখানেই মৃত্যুবরণ করে।

'মনোবিজ্ঞান বহু আগে থেকে বলে আসছে মানুষের নার্ভাস আবেগগুলো মস্তিষ্কের ইলেকট্রো-কেমিক্যালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই আবেগগুলো যখন

অ্যাকশনের মধ্যে থাকে তখন একটি ঢেউয়ের সৃষ্টি করে কিন্তু মনোবিজ্ঞান তা স্বীকার করে না।

'টেলিপ্যাথির ব্যাপারটা উদাহরণ হিসেবে নাও। প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি ভাবনার নিজস্ব একটি ছন্দ আছে যেগুলো মস্তিষ্কের মধ্য থেকে প্রবাহিত হওয়ার সময় আলাদা আলাদা একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে। আর কোন যন্ত্র যদি সেভাবে তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা ওই চিন্তার ঢেউগুলোকে ধরতে পারবে এবং ওগুলোকে তাদের প্রকৃত ধ্বনিতে রূপান্তরিত করতে পারবে।

'তুমি জানো, একটি নির্দিষ্ট সংগীতের সুর কত পরিষ্কারভাবে তোমার মনে খেলা করে। নির্দিষ্ট একটি বাদ্যযন্ত্রের ছন্দ কিংবা কণ্ঠ তোমার মস্তিষ্কে কাজ করে। আর তোমার ক্ষেত্রে এটা হাজারগুণ বেশি নিখুঁতভাবে কাজ করবে এইজন্য যে তুমি একজন দক্ষ পিয়ানোবাদক।

'তো ব্যানক্রফট, এতক্ষণ বক্তৃতা দেয়ার পেছনের কারণটা তুমি এখনই বুঝতে পারবে। তুমি এখন ভাবতে থাকো। ভাবো এমন কিছু সুর এবং সংগীতের কথা যেগুলো তুমি বহুবার বাজিয়েছ, শুনেছ, স্বরলিপির পর স্বরলিপি লিখেছ তোমার নোটখাতায়। এই পিয়ানোর ওপরে তোমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করো। তারপর তোমার সংগীতের কথা ভাবো।'

স্রেফ কৌতূহল নিয়ে এতক্ষণ ফারবারের কথা শুনছিলাম আমি। লাল রঙের পিয়ানোটাকে আমার খেলনার মতই মনে হচ্ছে। গ্লাসের কালো তরল জিনিসটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে। ফারবারের ঘামে ভেজা চেহারায় সমাহিত একটা ভাব। হাতের মুঠি সে বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে।

আমি পিয়ানোর কিছু সুর মনে করার চেষ্টা করলাম। ওগুলোর শিরোনাম, সুরকারদের নাম আমার মাথায় খেলে যেতে লাগল: ওয়ালৎজ, স্কেরজো, ক্যাপ্রিস—আচ্ছা, ফারবারের চিঠি যখন এল তখন বাসায় বসে কি সুর ভাঁজছিলাম আমি?…সেইন্টসন্স ডনস ম্যাকাবর। সুরটাকে মনে পড়তেই বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটল। পাঁচফুট দূরের পিয়ানোটা প্রবলবেগে নড়তে শুরু করল। লাল রঙের বাল্ব হয়ে উঠল চোখ ধাঁধানো কমলাবর্ণ, কী বোর্ডের চাবিগুলো নড়ে উঠল—যেন অদৃশ্য একটা হাত ওগুলোকে চালাচ্ছে! পিয়ানো থেকে যে সুরটা ভেসে এল ওটাই আমি কয়েক সেকেন্ড আগে মনে মনে ভেবেছি!

হতভম্ব হয়ে ফারবারের দিকে তাকালাম। চোখ বিস্ফারিত করে সে পিয়ানোটার দিকে চেয়ে আছে।

'এটা…এটা আমার মনের কথা পড়তে পারছে!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

একের পর এক আমার মনে পড়তে লাগল পরিচিত সুরগুলো। প্রতিটি সংগীত অবিকল বাজিয়ে চলল ভৌতিক পিয়ানো। ঘর ভরে উঠল সংগীতের মূর্ছনায়।

আমি বোধহয় হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম, পিয়ানোর আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে এল, একসময় চাবিগুলো স্থির হয়ে গেল।

বিজয়ী ভঙ্গিতে আমার দিকে ফিরল ফারবার। 'কি, এবার বিশ্বাস হলো তো? মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছ বলে ওটা থেমে গেছে। আবার মনোযোগ দাও। যে কোন সংগীত বাজাতে শুরু করবে আমার আবিষ্কার।'

আমার মুখে কোন কথা যোগাল না। হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে থাকলাম ফারবারের দিকে। এ আমি কি দেখলাম? এ কি করে সম্ভব হলো?

'প্রমাণ পেলে তো, ব্যানক্রফট,' বলল সে। 'পিয়ানোটা আমার চিন্তা চেতনাকে প্রমাণ করেছে, গবেষণার এক নতুন জগৎ উন্মোচন করেছে। তবে এটা শুরু মাত্র। এটার আরেকটা মজা তোমাকে দেখাই, এসো।'

পিয়ানোর দ্বিতীয় নব, যেটা আগে লক্ষ করিনি, ধরে মোচড় দিল ফারবার। আবার বাজতে শুরু করল ওটা। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম এতক্ষণ যে সব সুর বাজিয়েছি যন্ত্রটা এখন সেগুলোই রিপিট করছে। তার মানে এটাকে দিয়ে যে কেউ তার সৃষ্ট সুর কোন পরিশ্রম ছাড়াই বারবার শুনতে পারবে। পিয়ানোটাকে নিয়ে দৌড়ে পালাবার ইচ্ছেটাকে বহু কষ্টে দমন করলাম আমি।

'জিনিসটা বিক্রি করবে?' খসখসে গলায় বললাম আমি। 'আমাকে এটার একটা নকল বানিয়ে দেবে? যা দাম চাও তাই দেব—যত চাও!'

নীরবে আমাকে লক্ষ করল ফারবার, তারপর ভেবেচিন্তে জবাবটা দিল।

'পিয়ানোটার কিছু কাজ এখনও বাকি,' বলল সে। 'বেশ কিছু পার্টস আরও লাগাতে হবে। সব কাজ শুরু করতে এখনও সপ্তাহ তিনেক সময় লাগবে। তবে এই সময়ের জন্য তুমি এটা ধার হিসেবে নিতে পারো তোমার নতুন সোনাটার ওপর কাজ করার জন্য।' একটু থামল সে। ধারাল হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। 'তবে এক শর্তে। যদি তোমার নতুন সংগীত জনপ্রিয় হয় তবে তোমাকে অবশ্যই সবাইকে জানাতে হবে সংগীতটা তোমার মস্তিষ্ক উদ্ভূত হলেও এই পিয়ানোর কাছে এজন্য বহুলভাবে ঋণী। আমি চাই আমার পিয়ানোর পরিচিতি হোক একজন বিখ্যাত সংগীতকারের মাধ্যমে। কি রাজি?'

'রাজি,' বললাম আমি।

'তাহলে আমি কাল পিয়ানোটা তোমার বাসায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব। কারণ এত ভারী জিনিস এখন একা বয়ে নিতে পারবে না।'

আমি সায় জানিয়ে ওর পিছু পিছু এগোলাম। অন্ধকার হলঘর পেরিয়ে বাইরে এলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইলাম, 'তুমি যন্ত্রটায় নতুন কি ব্যবহার করবে জানতে পারি কি? আমার তো ওটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে।'

'জিনিসটা এখন শুধু হুকুম তামিল করতে পারে,' হালকা বৃষ্টি আর কুয়াশার দিকে চোখ রেখে নিচু গলায় বলল ফারবার। 'শব্দ বা ধ্বনি থেকে যা আসে পিয়ানোটা তাই বাজাতে পারে। কিন্তু আমি চাই একদিন নিজেই ওটা সুর সৃষ্টি করবে।'

দুই সপ্তাহ পিয়ানোটা আমার কাছে থাকল। দুটো প্রবল উত্তেজনাকর সপ্তাহ আমি কাটালাম ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে। সম্মোহিত মানুষের মত ডুবে গেলাম নিত্যনতুন সংগীত আর সুর সৃষ্টিতে।

এই চোদ্দদিনে আমি যেসব গান রচনা করেছি সেগুলো হলো: ভালস দু ডায়াবল, আইডলস টু মার্থা, মাউন্টেন ক্যাপ্রিস এবং দ্য মার্চ অভ দ্য

ক্যানোনিয়ারস। আমার তৈরি এ যাবৎ কালের সেরা কমপোজিশন বলে মনে হলো এগুলোকে। এই কাজগুলো শেষ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমার স্বপ্নের সংগীত 'সোনাটা ইন বি ফ্ল্যাট মাইনর'-কে নিয়ে।

ফারবার বলেছিল এই যন্ত্রের প্রধান সম্পদ হচ্ছে সুরের পুনরাবৃত্তি। সংগীতের অষ্টক, প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে রিপিট করে চলল ওটা। কল্পনার জগতে ভাসিয়ে দেই মনকে, তারপর পিয়ানোটার দ্বিতীয় নব ধরে ঘোরাতেই আমার সকল সুর নোট করে নেয় ওটা পাতার পর পাতা, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার বাজিয়ে চলে আমার গান।

পিয়ানোটা যেন যাদু করে ফেলল আমাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওটার সামনে বসে থাকি আমি নাওয়া খাওয়া ভুলে। বিরতিহীনভাবে যন্ত্রটা কাজ করে চলে। যেন একটা শয়তান ভর করেছে ওটার ওপর, সাদারঙের ছোট চাবিগুলো অলৌকিক শক্তিতে ক্রমাগত বেজেই চলে।

তারপরও কেন জানি একটা অস্বস্তিতে ভুগতে থাকি আমি। মনে হয় পিয়ানোটা জ্যান্ত, লুকানো চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে।

পনেরো দিনের মাথায় মার্থা ওর গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরে এল। আমি সেদিনই ওর সঙ্গে দেখা করলাম। মার্থার সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে আগেই, শিগ্গিরই বিয়ে করতে যাচ্ছি ওকে। এই ক'টা দিন ও লন্ডন ছিল না। অসম্ভব একাকীত্ব গ্রাস করেছিল আমাকে। মার্থার সঙ্গে আমার পরিচয় বছর খানেক আগে এক সংগীতানুষ্ঠানে। পিয়ানোর প্রতি ওরও আগ্রহ প্রবল, বাজায়ও বেশ ভাল। লন্ডনের প্রথম সারির পিয়ানোবাদকদের মধ্যে মার্থা একজন। ব্রাহ্‌মের সুর ও আমার চেয়ে অনেক ভাল বাজায়। পিয়ানোর প্রতি ওর আগ্রহ আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বকে দ্রুত জোরদার করে তোলে। সম্পর্কটা এত নিবিড় এবং গাঢ় হয়ে ওঠে যে সিদ্ধান্ত নিই বিয়ে করব।

মার্থার মুখ অন্ধকার। চোখে শঙ্কার ছায়া স্পষ্ট, হাসিখুশি ভাবটা চেহারা থেকে সম্পূর্ণ উধাও।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলাম।

'ওই কারি আবার', জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে মৃদু গলায় বলল মার্থা।

'কারি?' আমি চট করে বিপরীত দিকের ঘরটার দিকে তাকালাম। কিন্তু মেয়েটাকে চোখে পড়ল না।

বছরখানেক আগে মার্থা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভ্রমণে গিয়েছিল। জ্যামাইকার এক গ্রামে কারিকে দেখে সে। কারি আফ্রিকা থেকে আগত ক্রীতদাসদের বংশোদ্ভূত একটি মেয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান নিগ্রোরা এখনও ওখানে ডাকিনী চর্চা করে। কারি তাদেরই একজন। কি কারণে জানি না মার্থা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল কারির প্রতি। হয়তো অল্প বয়েসী একটা মেয়ে না বুঝে অন্ধকার একটা জগতে বাস করছে, এই ভেবে করুণা হয়েছিল মার্থার। সে লন্ডনে ফেরার পথে কারিকে সঙ্গে নিয়ে আসে। তখন থেকে কারি ওর সঙ্গেই আছে। ফাইফরমাশ খাটে।

মার্থা যখন প্রথম আমার সঙ্গে কারির পরিচয় করিয়ে দেয়, কিশোরী মেয়েটা তখন খুব হাসছিল। 'ওখানে মেয়েটার জীবন নরক হয়ে উঠেছিল' মার্থা বলেছিল

আমায়। 'শয়তানের পূজায় তরতাজা জীবনটাকে এভাবে ধ্বংস করবে এ আমি সহ্য করতে পারিনি। তাই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি।'

কিন্তু মার্থা কারিকে ঠিক কাজের মেয়ের মত দেখত না। ও যতই চেষ্টা করেছে মেয়েটাকে পাশ্চাত্য পোশাক পরাতে, ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে, কারি যেন ততই তার ফেলে আসা জীবনকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। বহুবার ওকে দেখা গেছে বিড়বিড় করে যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করতে, অনেকদিন সে জ্যোতিষীদের মত ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। আমি বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেছি অন্তত বারতিনেক তার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

'এবার তোমাকে সে কি বলেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি মার্থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল আমার বাগদত্তা স্ত্রী। তারপর সংক্ষেপে কারির সর্বশেষ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বলল সে।

চেশায়ারে, মার্থার গ্রামের বাড়ি থেকে লন্ডন ফেরার পথে কারি মার্থার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করে। বলে তাদের এখন লন্ডন যাওয়া উচিত হচ্ছে না। কারণ তার আশঙ্কা লন্ডন পৌঁছার পর, অদূর ভবিষ্যতে তারা দু'জনেই ভয়ঙ্কর কোন বিপদে পড়তে পারে।

'তুমি ওর কথা আর পাত্তা দিও না তো,' বললাম আমি। 'ওসব পাগলের প্রলাপ।'

'এক সময় আমিও তোমার মত পাগলের প্রলাপ ভেবে কারির কথা উড়িয়ে দিয়েছি।' আস্তে আস্তে বলল মার্থা। 'কিন্তু—কিন্তু কারিকে তুমি ঠিক চেনো না। মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় ওর মধ্যে আসলেই কোন অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এমন কিছু ব্যাখ্যার অতীত ক্ষমতা যেটা আসলে আমরা বুঝতে পারি না।'

ওকে অভয় দিলাম আমি। ভয় দূর করার চেষ্টা করলাম। তারপর দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে। ফারবারের অদ্ভুত আবিষ্কার ওকে দেখাব কি দেখাব না ভেবে দোটানায় ভুগছি আমি। কারণ মেয়েটা যদি আরও ভয় পায়।

কিন্তু ভয় পেল না মার্থা। বরং আগ্রহ অনুভব করল যন্ত্রটা দেখার জন্য। খুশি মনে বাসায় চলে এলাম। দুই পা এগোতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

নেই! পিয়ানোটা নেই। ওয়ালনাট কাঠের টেবিলটা খাঁখাঁ দাঁড়িয়ে আছে মেঝেতে। এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি, হতাশার গহ্বরে যেন তলিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ মেঝের ওপর কাগজের একটা টুকরো চোখে পড়ল আমার। তুলে নিলাম। একটা চিঠি। ওতে লেখা:

ব্যানক্রফট:

আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু পিয়ানোটার যে রদবদল করতে চেয়েছি সেগুলো এখন রেডি। ফলে আগে ভাগেই জিনিসটা নিয়ে যেতে হলো। তবে আশা করছি যে সংক্ষিপ্ত সময়টুকু তুমি এই আশ্চর্য আবিষ্কারকে নিজের কাছে রাখার সুযোগ পেয়েছ নিশ্চয়ই তখন এটার সদ্ব্যবহার করতে ভোলোনি। যদি পিয়ানোটা কাজে লেগে থাকে তাহলে তোমার প্রতিশ্রুতির কথা নিশ্চয়ই ভুলবে না। সমস্ত ক্রেডিট দিতে হবে এই পিয়ানোকে। আর হ্যাঁ, পিয়ানোটার বাকি কাজগুলো দ্রুত শেষ করতে

পারলেই এটা তোমাকে আবার কিছুদিনের জন্য ব্যবহার করতে দেব।

উইলসন ফারবার।

যেন স্বর্গ থেকে মর্তে ছিটকে পড়লাম আমি। সেই মধুর সময়গুলো, যেন আরব্য রজনীর কোন গল্প বলে মনে হয়েছিল, সেগুলোকে এখন স্বপ্ন বলে মনে হলো। তবে আমি সুযোগটা হেলায় হারাইনি। যন্ত্রটার অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করে ঠিকই আমার 'সোনাটা ইন বি ফ্ল্যাট মাইনর'-এর কাজ শেষ করেছি।

পরদিন সকালে আমাকে পুরানো বন্ধু মেজর আলডেনের দেশের বাড়ি যেতে হলো। আলডেন বৃটেনের খুবই বিখ্যাত মিউজিক পাবলিশার। ও আমাকে অনুরোধ করেছিল ওর কিছু বন্ধু আসবে বেড়াতে, আমি যেন তাদেরকে আমার কিছু বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় সংগীত শোনাই। ওর অনুরোধ রক্ষা করতেই আমার এই যাত্রা। আমি মার্থাকে ফোন করে ট্রেনে চেপে বসলাম।

তিনদিন পর। তিক্ত মন নিয়ে ফিরে চলেছি লন্ডনে। মেজাজটা বিগড়ে আছে খুব। আলডেনের বন্ধুরা সংগীতের 'স'ও বোঝে না, বরং সংগীত পরিবেশনের সময় ক্রিকেট নিয়েই আলোচনায় ব্যস্ত থেকেছে তারা। এদেরকেই কিনা আমি গান শোনাতে গিয়েছিলাম? ছ্যা!

লন্ডন পৌঁছার পর একটা পত্রিকা পড়তে গিয়ে ছাঁৎ করে উঠল বুক। 'দ্য টাইমস'-এর প্রথম পাতায় বড় হেডিং-এ তিন কলাম জুড়ে লেখা খবরটা: **বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মার্থা ফ্রেমিং নিখোঁজ।**

মার্থার নিখোঁজ সংবাদ প্রচণ্ড আলোড়ন তুলল সংগীত জগতে। ওর মত ভাল মেয়ের জীবনে এমন কিছু ঘটতে পারে বিশ্বাসই করতে চাইল না অনেকে। ভয়ানক মর্মাহত হলো সবাই। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড মার্থাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিল।

মার্থার বাড়িওয়ালার কাছ থেকে তেমন কোন খবর জানতে পারলাম না আমি. নিখোঁজ হবার দিন রাত আটটার সময় সে বাসা থেকে বেরিয়েছিল কাছের মিষ্টির দোকানটা থেকে কিছু কিনতে। প্রতিদিনই মার্থা ওই দোকান থেকে কিছু না কিছু কিনত। তবে বাড়িওয়ালা সেদিন ওকে লক্ষ করেছিল কারণ কারি, মার্থার নিগ্রো কাজের মেয়েটার কিছু অদ্ভুত আচরণ তার নজর কাড়ে। দরজা বন্ধ করে মার্থা রাস্তায় বেরুতেই নিগ্রো মেয়েটাও শিকারী বেড়ালের মত তার পিছু নেয়।

তারপর দু'জনের কেউই আর ফিরে আসেনি!

মার্থার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ওর ফ্ল্যাটের অন্য ভাড়াটেদের কাছেও অনেক প্রশ্ন করলাম। ওর ঘরগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। যদি কোন 'ক্লু' পাই। কিন্তু কিছুই পেলাম না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও কোন সন্ধান দিতে পারল না। মার্থা আর কারি যেন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে ভিন্ন এক জগতে।

রাতের বেলা আমি মার্থার সন্ধানে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ালাম রাস্তায়, প্রতিটি পথচারীকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করলাম। যদি মার্থার দেখা পাই: কিন্তু সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হলো।

মার্থার নিখোঁজ হবার পেছনে কোন কারণ খুঁজে পেলাম না আমি। যদি ওকে কেউ অপহরণ করত এতদিনে মুক্তিপণ দাবি করত নিশ্চয়ই, আর যদি খুন হয়ে

থাকে--শিউরে উঠলাম আমি। কারির কুৎসিত ভবিষ্যদ্বাণীই কি শেষ পর্যন্ত ফলতে চলল···এই রহস্যের কোন সমাধানই কি মিলবে না কোনদিন?

এক রাতে রাস্তায় মার্থাকে বৃথাই খুঁজে হতোদ্যম ক্লান্ত আমি ফিরে এলাম বাসায়।

চেয়ারে বসে চুপচাপ ভাবছি, এই সময় আমার মনটাকে আরও খারাপ করে দিতেই যেন এল সে—উইলসন ফারবার। কড়া না নেড়েই ঢুকে পড়ল লোকটা ঘরের ভেতরে, আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ঘর থেকে বের করে টেনে নিয়ে চলল টানা বারান্দা দিয়ে।

'তোমার পিয়ানো সম্পর্কে আমার এখন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, ফারবার,' বিরক্ত হয়ে বললাম আমি। 'তুমি ওটাকে নিয়ে আর কি কারুকাজ করেছ সে বিষয়েও কিছুমাত্র কৌতূহল বোধ করছি না আমি। আমি এখন অন্য চিন্তায় অস্থির। দয়া করে এখন কেটে পড়ো। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'আমি তোমার ব্যাপারটা জানি, ব্যানক্রফট,' বলল সে। 'কিন্তু সংগীতে দক্ষ এমন একজন লোককে আমার ভীষণ দরকার যে আমার যন্ত্রটার নতুন কাঠামোটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে। সেক্ষেত্রে তুমিই—'

'অন্য কারও কাছে যাও,' বাধা দিলাম আমি। 'না হলে ওটাকে টেমস নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

'তুমিই একমাত্র লোক যাকে আমি বিশ্বাস করেছি, ব্যানক্রফট। তোমাকে বিশ্বাস করে সব গোপন কথা বলেছি। চলো আমার সঙ্গে। ওটা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। বরং তোমার মনটাকে ভাল করে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

স্বপ্নের ঘোরে যেন আমি এগিয়ে চললাম ফারবারের সঙ্গে। একটা ক্যাব ভাড়া করে আমাকে নিয়ে উঠে পড়ল ও।

ফারবারের সেই অদ্ভুত মিউজিক চেম্বারের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। বাদ্যযন্ত্রগুলো আগে যেখানে যেভাবে ছিল এখনও সেভাবেই রয়েছে। কিন্তু পিয়ানোটাকে অপারেটিং টেবিলের ওপর দেখলাম না। ফারবারের দৃষ্টি অনুসরণ করতেই জিনিসটাকে চোখে পড়ল।

ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষা একটা শেলফের ওপর পিয়ানোটা রাখা, ছাদের ঠিক নিচে। ওটার দিকে তাকাতেই সেই অনুভূতিটা আবার কাজ করল মনে। যেন জিনিসটা আমাকে দেখছে।

'যন্ত্রটাকে আমি ওখানে রেখেছি,' ব্যাখ্যা করল ফারবার, 'কারণ দেখলাম উঁচুতে রাখলে ওটা চিন্তা তরঙ্গ খুব দ্রুত ধরতে পারে। এখন তোমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করো। আমি টিউনিং অ্যাডজাস্ট করব।'

একটা চেয়ার দাঁড় করাল ফারবার দেয়ালের পাশে, উঠে দাঁড়াল ওটার ওপরে। যন্ত্রটার ছোট ডায়াল ঘোরাতে শুরু করল। পাঁচ সেকেন্ড পর দেখলাম, ছোট বাল্বটার টকটকে লাল আর টিউবের ভেতরের কালো রঙের পদার্থ দুটো ফুটতে লাগল টগবগ করে, আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে।

'এখন গোটা ব্যাপারটাই তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি আমি।' মেঝেতে নেমে এল ফারবার। দরজার কাছে গিয়ে ওটা খুলল, ঘুরে দাঁড়াল আমার

মুখোমুখি। 'ব্যানক্রফট,' নরম গলায় বলল সে, ''আশা করছি তুমি শীঘ্রই আমার সঙ্গে একমত হবে যে যন্ত্রটার এমন কিছু উন্নয়ন আমি ঘটিয়েছি যা সত্যি বিস্ময়কর।'' '

সময় বয়ে চলল। সেই অস্বস্তিবোধটা ফিরে এল আমার ভেতরে। টিউবের ভেতরের জিনিসটাকে হৃৎপিণ্ডের মত মনে হলো। ছন্দায়িত গতিতে যেন কাজ করে চলেছে। ওটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে যেন ঘোর লেগে গেল আমার।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে জেগে উঠলাম। ভাবতে শুরু করলাম আমার সোনাটা ইন বি ফ্ল্যাট মাইনরকে নিয়ে। যন্ত্রটার পরিবর্তন করেছে ফারবার, তাই না? দেখা যাক কি পরিবর্তন এনেছে সে ওটার মধ্যে।

সোনাটার প্রথম লাইনগুলো বিদ্যুতের মত খেলে গেল মাথায়। শেলফের ওপর পিয়ানোটা যেন মোচড় খেল একটা, তারপর বেজে উঠল পরিচিত সুরে। আমি সামনের দিকে ঝুঁকলাম, উল্লাসের অদ্ভুত একটা ঢেউ ছুঁয়ে গেল শরীরে। হঠাৎ মনে হলো কি যেন একটা ভজকট আছে এটার মধ্যে। একটা গন্ধ এল নাকে, পচা, বিকট একটা দুর্গন্ধ গা গুলিয়ে দিল আমার। বিশ্রী গন্ধটা আসছে পিয়ানোটা থেকে, দূষিত করে তুলল বায়ু।

কিছু বোঝার বিন্দুমাত্র অবকাশ না দিয়ে ঘটনাটা ঘটল। আমার চিন্তা তরঙ্গ তাৎক্ষণিকভাবে ধারণ করে খুদে পিয়ানোটা সোনাটার সুরগুলো বাজাতে শুরু করল। আমি যেভাবে কমপোজ করেছি অবিকল সেভাবে। হঠাৎ ওটা নীরব হয়ে গেল। এক মুহূর্ত পরেই গগনবিদারী শব্দে সবগুলো চাবি যেন বিস্ফোরিত হলো। আবার বাজতে শুরু করল পিয়ানো, আমার সোনাটার সুর বাজিয়ে চলল মাঝখান থেকে। আতঙ্কিত বিস্ময়ে আমি স্থির হয়ে গেলাম।

আমার সোনাটা। হ্যাঁ, ওটা আমার নিজস্ব সুর বাজাচ্ছে, আমার সেরা সৃষ্টিতে সুর তুলছে। কিন্তু এ আমি কি শুনছি। আমার সুর এভাবে পরিবর্তন হলো কি করে? এত ভয়ঙ্কর, বীভৎস এবং অশ্লীল সুরে বাজছে। যেন অন্ধকার কবর থেকে উঠে আসছে শব্দগুলো, বেসুরো আওয়াজে দড়াম দড়াম করে আছড়ে পড়ছে কানের পর্দায়। আমার সোনাটা, শান্ত সরোবরের মত গভীর আর কোমল যার সুর সেই মিষ্টি সোনাটা হতাশা, আতঙ্ক আর অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনছে আমার কাছে এত কুৎসিত এই সুর যার সঙ্গে শুধু পৈশাচিকতার তুলনা হতে পারে। কোন মানুষের পক্ষে এই পৈশাচিক সংগীত শোনা সম্ভব নয়।

চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে মনে হলো দেয়ালের গায়ে আঁকা স্বরলিপিগুলো যেন ভেঙচি কাটছে আমাকে, ম্যানডেলিন আর বীণাগুলো চিৎকার শুরু করেছে তারস্বরে। পিয়ানোটা যতবার আমার সোনাটার পুনরাবৃত্তি করল ততবার যেন আওয়াজটা আরও শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। যেন প্রতিবার ওটা শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।

অভিজ্ঞ সংগীতকার আমি, বহুবছরের অভিজ্ঞতা আমার, কিন্তু এমন বীভৎস সংগীত জীবনে শুনিনি আমি। কদাকার আর ভয়ঙ্কর এই সংগীত যে কোন মানুষকে পাগল করে দিতে যথেষ্ট।

তৃতীয়বার সোনাটার পুনরাবৃত্তির সময়ে পিয়ানোটা যেন হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে

বিস্ফোরিত হলো। আর সহ্য করতে পারলাম না। বিকট চিৎকার করে দাঁড়িয়ে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে, বেগে দৌড় দিলাম দরজা লক্ষ্য করে। টলতে টলতে কোনমতে বাইরে চলে এলাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। জনশূন্য রাস্তার নির্জন পরিবেশ আমাকে ধীরে ধীরে শান্ত হতে সাহায্য করল। আস্তে আস্তে হেঁটে চললাম আমার বাড়ির দিকে। মনে হলো পেছনে অন্ধকারে কে যেন আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। বাতাসে যেন ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা।

পরদিন লন্ডন শহরে চিরুনি অভিযান চালালাম আমি মার্থার সন্ধানে। যে করে হোক ওর খোঁজ আমার চাই। গলির গলি তস্য গলি খোঁজাও বাদ দিলাম না, যারা এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করল তাদের সবার সঙ্গে কথা বললাম। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে অনুরোধ করলাম ওদের অভিযান যেন আরও জোরদার করে।

রাত। এসেক্সস্ট্রীট দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি। এক ড্রাইভার বলেছে মার্থা যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিন সে দুটি মেয়েকে এদিকে কোথাও নামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারেনি সে।

আজ আবার কুয়াশা পড়েছে। ঘন এবং ভেজা। রাস্তার বাতির আলো কুয়াশায় ম্লান, হলদেটে লাগছে। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম আসলে এলোমেলো ঘুরছি না আমি, পা দুটো আমাকে টেনে নিয়ে চলছে শহরের একটি বিশেষ এলাকার দিকে যেখানে এর আগেও আমি কয়েকবার গিয়েছি।

কোথায় যাচ্ছি আমি? থমকে দাঁড়ালাম। রাগের একটা হল্কা বয়ে গেল শরীরে। এ দেখি মিলফোর্ড লেনে চলে এসেছি। দাঁড়িয়ে আছি উইলসন ফারবারের ৯৪ নম্বর বাড়ির সামনে। গতরাতের ভয়াবহ ঘটনাগুলো মনে পড়তেই কেঁপে উঠলাম আমি।

অন্ধকার এই বাড়িটার মধ্যে চুম্বকের মত কি যেন আছে, শুধু টানে। টের পেলাম বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলেছি আমি। একই সঙ্গে ভেতর থেকে কে যেন সতর্ক করে দিল আমাকে। আর তারপর…

বাড়িটার ভেতরে, কোত্থেকে যেন ভেসে এল আওয়াজটা, নির্জন রাস্তায় যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। আর্তনাদ করছে এক নারী। আর এই গলার আওয়াজ আমার খুবই পরিচিত!

গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল আমার, এক লাফে পৌঁছে গেলাম দরজার সামনে, লাথি মেরে খুলে ফেললাম দুই পাট, ঢুকলাম ভেতরে। লম্বা বারান্দাটা অন্ধকার। চারদিক অদ্ভুত শুনশান। শুধু আমার জুতোর শব্দ উঠল মেঝেতে।

বারান্দার শেষ মাথায় পৌঁছে গেলাম আমি। মিউজিক রুম সংলগ্ন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কান পাতলাম। কোন আওয়াজ নেই। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর নব ধরে মোচড় দিলাম। খুলে গেল দরজা। ভেতরের দৃশ্যটা দেখতেই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম।

ঘরটা আগের মতই উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ঘরের মাঝখানে, অপারেটিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে উইলসন ফারবার। আর অপারেটিং টেবিলে মৃতবৎ পড়ে আছে একটা মেয়ে, আমার বাগদত্তা স্ত্রী মার্থা ফ্লেমিং!

পরে যে ঠিক কি ঘটল আমি বলতে পারব না। শুধু মনে আছে ফারবার আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল বলে আমার উপস্থিতি টের পায়নি। মার্থার মুখের দিকে ঝুঁকে বিড়বিড় করে ও কি যেন মন্ত্রোচ্চারণ করছিল।

বাঘের মত লাফ দিলাম আমি, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে ধাক্কা দিলাম। ছিটকে পড়ে গেল ফারবার। সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে দাঁড়াল। ঘৃণা আর রাগে ওর মুখটা বিকৃত দেখাল।

'অঃ, তুমি ব্যানক্রফট,' হিসহিস করে উঠল সে। 'এসে গেছ তাহলে, অ্যাঁ? ভাল ভাল আমি তোমাকেই আশা করছিলাম। তবে একটু দেরি করে ফেলেছ। আরেকটু আগে এলে দুর্দান্ত একটা অপারেশন দেখতে পেতে।'

আমি ওর হাত খামচে ধরলাম। 'তুমি যদি ওর কোন ক্ষতি করে থাকো তাহলে আমি...'

'ও এখন সম্মোহিত হয়ে আছে,' বলল ফারবার। 'কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে। আমি ওর আত্মাটা নেব এবং—'

প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলাম ফারবারের চোয়ালে। পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। দু'জনের মাথাতেই খুনের নেশা। কিন্তু ফারবারের শক্তি আমার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও ওকে ছাড়লাম না।

মেঝেতে গড়াতে গড়াতে এক পর্যায়ে ফারবার হাঁটু দিয়ে আঘাত করল আমার তলপেটে, প্রায় অজ্ঞান হবার দশা হলো আমার প্রচণ্ড ব্যথায়। আমার একটা হাত মুচড়ে ধরল ফারবার, পিঠের দিকে ঠেলতে শুরু করল, ভেঙে ফেলবে।

এক ঝাঁকুনিতে আমাকে শূন্যে তুলে ফেলল সে, পরক্ষণে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। মাথা প্রবলভাবে ঠুকে গেল দেয়ালে। যেন চলন্ত ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। চোখের সামনে আলোগুলো হঠাৎ ঝলসে উঠল, তারপরই জ্ঞান হারালাম।

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম জানি না, জ্ঞান ফিরে দেখি আমার হাত আর পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মাথাটা ব্যথায় দপদপ করছে। আমার একটু সামনে ফারবার দাঁড়িয়ে আছে, ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি।

'অপারেশনটা তোমার জন্য আমি কিছুক্ষণের জন্য পিছিয়ে দিয়েছি, ব্যানক্রফট,' বলল সে। 'আমি জানি তুমি ব্যাপারটা মিস করতে চাইবে না।'

'ঈশ্বরের দোহাই,' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'তুমি আসলে কি করতে চাইছ?'

এক মুহূর্তের জন্য সে আমার দিকে স্থির চোখে তাকাল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ডানদিকের দেয়ালে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। ওখানে, শেলফের ওপর ঝুলছে সেই শয়তানের পিয়ানো।

'ওই পিয়ানো দিয়ে, ব্যানক্রফট,' বলল ফারবার, 'আমার দশ বছরের স্বপ্ন অবশেষে পূরণ করতে যাচ্ছি। আমি এমন একটা কাজ করব যা কেউ কল্পনাও করেনি। যন্ত্রটা এখন তোমার চিন্তা-তরঙ্গ ধারণ করে সেইভাবে সুর সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আমি ওর কাছ থেকে আরও কিছু চাই। চাই ও কমপোজ করবে...সৃষ্টি করবে সুর...কারও সাহায্য ছাড়াই তৈরি করবে অনবদ্য সব সংগীত।'

'তুমি ঠিক পাগল হয়ে গিয়েছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফারবার, 'পাগলামি? এটা তো মনের একটা আপেক্ষিক স্তরমাত্র। হয়তো আমি সত্যি পাগল। আমি যদি তাই হই তাহলে মধ্যযুগের জ্ঞানী রসায়নবিদরাও তাই ছিলেন। তুমি কখনও রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করেছ, ব্যানক্রফট? যাদুবিদ্যার ওই অধ্যায় এখন একটি হারানো শিল্প। তাঁরা সীসা থেকে সোনা তৈরি করতেন, আর এই পরীক্ষায় তাঁদের প্রয়োজন হত তরুণী কোন মেয়ের আত্মা।

'আর এতদিনে আমি খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছি, গতানুগতিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সংগীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। এর জন্য উষ্ণ কোন বস্তু চাই, আর সেটা হতে হবে কোন মেয়ের আত্মা। তারচেয়েও জরুরী মেয়েটাকে অবশ্যই গান-বাজনার সাথে জড়িত থাকতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছ, ব্যানক্রফট? মার্থা ফ্লেমিং সেরকম একটি মেয়ে।'

কোট খুলে ফেলল ফারবার, হাতা গোটাতে শুরু করল।

'আমি মার্থাকে এখানে ডেকে এনেছিলাম মিথ্যে সংবাদ দিয়ে। বলেছিলাম তুমি আমার বাসায় এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছ। কিন্তু আমি ভাবিনি যে নিগ্রো কাজের মেয়েটাও সঙ্গে আসবে। তবে কারি মেয়েটা খুব ইন্টারেস্টিং চরিত্রের ছিল। জানতাম না ও ডাকিনী চর্চা করে। ডাকিনী চর্চা এমন একটা জিনিস যেটা সম্পর্কে সভ্য জগতের মানুষের ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। তো কারিকে পেয়ে আমার লাভই হলো। প্রথম পরীক্ষাটা ওকে দিয়েই করলাম।

'তার মানে—'

'তার মানে কারি সংগীতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলেও ওর ডাকিনী চর্চার ব্যাকগ্রাউন্ড কাজে লাগতে পারে ভেবে ওর ওপর অপারেশনটা চালাই আমি। গতরাতে তুমি সম্ভবত টিউবের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মত একটা জিনিস লক্ষ করেছ। ওটা কারির হৃৎপিণ্ড। সে—'

'তুই ওকে খুন করেছিস!'

'হ্যাঁ, বিজ্ঞানের স্বার্থে,' আমার গালাগাল গায়ে মাখল না ফারবার। হাসিমুখে বলল, 'কিন্তু তারপরও পিয়ানোটা নিজে থেকে সুর সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে একেবারে হতাশ করেনি আমাকে। নিগ্রো মেয়েটার রক্তপান করে ও অনেকটাই সতেজ হয়ে উঠেছিল। এজন্যই গতরাতে তোমার সোনাটা সংগীত সে চমৎকার বাজাচ্ছিল।'

টেবিলের দিকে এগোল ফারবার, শক্তিশালী বাতিগুলো সাবধানে অ্যাডজাস্ট করল।

প্রচণ্ড অসহায়তা গ্রাস করল আমাকে। তীব্র আক্রোশে নীরবে ফুঁসতে লাগলাম। অপারেটিং টেবিলে চিৎ হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি, খুন হতে চলেছে সে। অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না।

অপারেটিং টেবিল ছেড়ে দেয়ালের দিকে পা বাড়াল ফারবার। আমার চোখ আঠার মত লেগে থাকল ওর গায়ে। ঝুলন্ত পিয়ানোটার ঠিক নিচে এসে দাঁড়াল সে। ওয়ালক্যাবিনেট থেকে এনামেলের একটা সাদা ট্রে তুলে নিল।

হঠাৎই ঘটনাটা ঘটল। পিয়ানোটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি, দেখলাম গ্রাস

প্যানেলের মধ্যে ছোট বাল্বটার রঙ প্রচণ্ড কমলা হয়ে উঠল। হাতির দাঁতের চাবিগুলো কাঁপতে শুরু করল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেলাম আমি। পিয়ানোটার সঙ্গে আমার মস্তিষ্কের একটি অদৃশ্য বন্ধন তৈরি হলো এক মুহূর্তে।

পরক্ষণে বুঝতে পারলাম সুর নেই, পিয়ানো থেকে উদগীরণ হচ্ছে তীব্র ঘৃণা। এই ঘৃণা এত সীমাহীন যার বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার নেই।

পিয়ানোর চাবিগুলো প্রবলভাবে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। যেন বজ্রপাত হলো ঘরে, একসঙ্গে সবগুলো তার বেজে উঠল, অকস্মাৎ দুলে উঠল পিয়ানো, নড়তে লাগল, কানফাটানো শব্দে গমগম করে উঠল ঘর।

এমন কিছুর জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল না ফারবার। বিস্মিত হয়ে ওপরে চাইল সে। হাত থেকে ট্রেটা ছিটকে পড়ল। ঝনঝন শব্দ তুলল মেঝেতে।

তারগুলো বেজেই চলেছে, হঠাৎ পিয়ানোর ভেতরের কোথা থেকে যেন নিচু স্বরে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠল, যেন দূরে কোথাও বৈদ্যুতিক মোটর চলতে শুরু করেছে।

শব্দটি এবার বেড়ে চলল, বাড়তে বাড়তে বীভৎস গর্জনে পরিণত হলো, কানের পর্দা ফেটে যাবার দশা। ভয়ানকভাবে কাঁপতে শুরু করেছে যন্ত্রটা, যেন ছিটকে আসবে শেলফ থেকে।

এই সময় প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। শেলফের কোনার দিকে লাফিয়ে উঠল পিয়ানো, ঝুলে থাকল, তারগুলোতে অবর্ণনীয় এক ভয়ের সুর তুলল।

লাফ দিল ফারবার পিয়ানোটাকে পতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

ওই উঁচু থেকে ছিটকে পড়ল ভারী যন্ত্রটা। নিজেকে রক্ষার সুযোগ পেল না ফারবার, সোজা ওর মাথার ওপর আছড়ে পড়ল ওটা যেন তীব্র আক্রোশ নিয়ে। থ্যাচ করে একটা শব্দ শুনলাম। মাটির সঙ্গে যেন মিশে গেল ফারবারের মাথা। মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে একবার, হাড় আর কাঠ ভাঙার শব্দ স্পষ্ট শুনলাম। অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি।

তারপরের ঘটনাগুলো মার্থাই আমাকে বলেছে। ফারবারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সম্মোহিত অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমেই আমার বাঁধন খুলে দেয় সে। তারপর আমরা বেরিয়ে আসি অভিশপ্ত ওই বাড়িটা থেকে। তারপর আমি আর কোনদিন ওই বাড়ির ত্রিসীমানাতেও যাইনি। কোনদিন না।

* * * *